চোলগণ

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে চোলবংশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। কিন্তু তার পূর্বে চোলগণ একেবারে অপরিচিত ছিল, এমন নয়। বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ চোলদের কথা জানতেন। অশোকের শিলালেখতে, তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, তাঁর সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে আবদ্ধ হিসাবে চোলদের উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস গ্রন্থে চোল অঞ্চলকে উপকূল ভাগ এবং অভ্যন্তর ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উপকূল ভাগের শাসন কেন্দ্র ছিল কাবেরীপত্তনম এবং অভ্যন্তর ভাগের, উরাইয়ুর। টলেমি চোল অঞ্চলের নগর ও বন্দরের মধ্যে কাবেরীপত্তনম এবং নেগপত্তমের উল্লেখ করেছেন। পালি গ্রন্থ মহাবংশে চোল অঞ্চলের সঙ্গে সিংহল দ্বীপের যোগাযোগের কথা আছে। মিলিন্দ পঞ্হোতে সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে কোলপত্তন বা কাবেরীপত্তনের উল্লেখ আছে।

খৃষ্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দীর সঙ্গম সাহিত্যে প্রাচীনতম চোল রাজাদের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। এই রাজাদের মধ্যে করিকাল সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন। তিনি প্রায় সমগ্র তামিল অঞ্চল অধিকার করেছিলেন। কিন্তু চোলদের এই গৌরব স্থায়ী হয়নি। পরবর্তী প্রায় পাঁচ শতাব্দী ধরে চোলগণ রাষ্ট্রকূট, চালুক্য অথবা পল্লবদের অধীন সামন্ত নৃপতি রূপে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পল্লবদের অধীন সামন্ত নৃপতি বিজয়ালয় নতুন ভাবে চোল রাজবংশের পত্তন করেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস প্রধানত চোলদের কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। চোল শক্তির অভ্যুদয়, চোলদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, প্রথমে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্র কূটদের সঙ্গে এবং পরে কল্যাণীর পশ্চিম চালুক্যগণের সঙ্গে চোলদের সংগ্রাম, এই সাড়ে তিনশ বৎসরের ইতিহাসের মূল বিষয়। এই সংগ্রামের ফলে তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণস্থ সমগ্র ভূভাগ দুই শতাব্দীর বেশি সময়ের জন্য রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। প্রথম রাজেন্দ্র গঙ্গাভিযানের মধ্য দিয়ে, অভূতপূর্ব নৌ-অভিযান দ্বারা শ্রীবিজয়ের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করে, এবং চীনে বারংবার রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে পূর্ব জগতে চোলদের নতুন সাম্রাজ্য শক্তি ঘোষণা করেন। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সংগ্রামে চোলগণ পূর্ব চালুক্যগণের সাহায্য লাভ করেছিল। বিভিন্ন বিবাহের মধ্য দিয়ে চোলদের সঙ্গে পূর্ব চালুক্যগণের সম্পর্ক ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত একজন শাসক যুগপৎ চোল এবং বেঙ্গির সিংহাসনে বসেছিলেন। পূর্ব চালুক্যগণের সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়,

পশ্চিম চালুক্যগণের সঙ্গে চোলদের শত্রুতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অবিরত সংগ্রামের ফলে এই দুই শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এর ফলে, উভয়ের অধীন বিভিন্ন শক্তি, যেমন দূর দক্ষিণের পাণ্ড্যগণ, মহীশূরের হোয়সলাগণ, উত্তর দাক্ষিণাত্যের যাদব এবং কাকতীয়গণের মধ্যে স্বাধীনতা ঘোষণার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল।

শুধু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নয়, অন্যান্য দিকেও চোলগণ স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছিল। তাদের রাষ্ট্র বিন্যাসে দৃঢ় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের সংগে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সার্থক সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। স্থাপত্য-ভাস্কর্য শিল্পে এই যুগে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। অসংখ্য ক্ষুদ্র মন্দির ভিন্ন তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরমের বৃহৎ মন্দির এই যুগের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। চোল রাজারা চারুশিল্পের বিভিন্ন শাখার, সঙ্গীত, নৃত্য এবং চিত্রকলার পোষকতা করেছিলেন। পূর্ব যুগের তুলনায় এই যুগে সাহিত্যে অগ্রগতিও বেশি হয়েছিল।

চোলদের আমলে দক্ষিণ ভারতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পিছনে চোলদের রাজনৈতিক এবং সামরিক শক্তি শুধু কাজ করেছিল, তা বলা যায় না। পল্লব আমলে যে তামিল সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, চোলদের সময় তা স্বচ্ছতর এবং নির্দিষ্টতর আকার লাভ করেছিল। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সমাজ সংগঠনে, ধর্মে এবং চারুশিল্পে এই যুগে যে মান নির্দিষ্ট হয়েছিল, তা শুধু দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেছিল, এমন নয়, সামগ্রিক ভাবে দাক্ষিণাত্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে, বিশেষত বাণিজ্যে, এই সময় দক্ষিণ ভারত যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি।

দক্ষিণ ভারতের চোল শক্তির পুনরভ্যুদয়ের স্রষ্টা বিজয়ালয় (৮৫০-৮৭১ খৃষ্টাব্দ) পল্লব রাজা নৃপতুঙ্গের অধীন সামন্ত নরপতিরূপে তাঁর রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ করেন। এই সময় মুত্তারায়রগণ পল্লব পক্ষ পরিত্যাগ করে পাণ্ড্য পক্ষে যোগদান করলে, বিজয়ালয় পল্লব রাজার হয়ে ৮৫০ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল আগে মুত্তারায়রগণের কাছ থেকে তাঞ্জোর অধিকার এবং সেখানে একটি দুর্গা মন্দির নির্মাণ করেন। চোল শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই ঘটনাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। বিজয়ালয়কে এইভাবে নিযুক্ত করে নৃপতুঙ্গ যে ব্যাঘ্র শিশুকে রক্তের আস্বাদ লাভের সুযোগ দিয়েছিলেন, তা তিনি ভাবতে পারেন নি। বিজয়ালয় যে এইভাবে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের সূচনা করে-ছিলেন, তা তাঁর কাছেও অভাবিত ছিল। তাঁর জয়লাভের ফলে একদিকে যেমন নৃপতুঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমন অন্যদিকে কাবেরী নদীর উত্তর-

ভাগে পাণ্ড্যদের প্রভাব হ্রাস পেয়েছিল। তাই পাণ্ড্য রাজা বরগুণ বর্মণ তাঁর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য পল্লব রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। প্রথম দিকে এই অভিযান অনেকটা সফল হয়েছিল। পাণ্ড্য সেনাদল কাবেরী নদীর উত্তর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। নৃপতুঙ্গের মৃত্যুর পরে তখন পল্লবদের রাজা ছিলেন অপরাজিত। তিনি পাণ্ড্য আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য একটি শক্তি সমবায় গঠন করেন। গঙ্গাবংশের রাজা প্রথম পৃথিবীপতি ছিলেন এই সম-বায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সদস্য। মনে হয় বিজয়ালয়ের মৃত্যুর পর চোল আদিত্য শ্রীপুরম্বিয়মের যুদ্ধে অপরাজিতর পক্ষে ছিলেন। এই যুদ্ধে জয়-লাভের সুফল আদিত্য ভোগ করেছিলেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত অপরাজিত তাঞ্জোরের উপর তাঁর অধিকার মেনে নিয়েছিলেন। তাছাড়া নিকটবর্তী কয়েকটি অঞ্চল অপরাজিত তাঞ্জোরের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

প্রথম আদিত্য (৮৭১-৯০৭ খৃষ্টাব্দ) পল্লবদের অধীনতা বেশি দিন মেনে নেন নি। তিরুবালঙ্গাদু পট্ট থেকে জানা যায় যে তিনি পল্লব নৃপতি অপরাজিতর উচ্ছেদ সাধন এবং তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। কন্যাকুমারী লেখতে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আনুমানিক ৮৯০ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম আদিত্যর হাতে পল্লবদের এই পরাজয় চূড়ান্ত হয়েছিল কিনা, বলা যায় না। কেননা পরবর্তী চোল রাজা প্রথম পরান্তককে পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তবে এই কাজ তিনি যুবরাজ হিসাবে করেছিলেন, এমন হতে পারে। সে যাই হোক, এই অভিযানের ফলে তোণ্ডাইনাদে পল্লব শাসনের অবসান ঘটেছিল, সমগ্র পল্লবরাজ্য চোল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং রাষ্ট্রকূট রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত এই রাজ্যের সীমা সম্প্রসারিত হয়েছিল। গঙ্গ-রাজা দ্বিতীয় পৃথিবীপতি হয়ত আদিত্যকে এই যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। অন্তত অল্পকাল পরে তিনি যে আদিত্যর সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কঙ্গুদেশ-রাজাক্কাল অনুসারে প্রথম আদিত্য কঙ্গুদেশ জয় ও শাসন করেছিলেন। এই কাহিনী পরবর্তী কালের এবং সর্বদা নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু উপরোক্ত তথ্যটি হয়ত মিথ্যা নয়, কেননা পরবর্তী চোল রাজা পরান্তকর লেখ কঙ্গুদেশে পাওয়া গেছে, অথচ তিনি কঙ্গুদেশ জয় করেছিলেন, এমন কোন সংবাদ জানা যায় না। আনবিল পট্টে বলা হয়েছে যে, প্রথম আদিত্য সহ্যাদ্রি থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ভূভাগে, সমগ্র কাবেরী তীরে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই বর্ণনাও উপরোক্ত ধারণাকে সমর্থন করে। তিল্লইস্থানমে প্রাপ্ত একটি তারিখ বিহীন লেখ থেকে জানা যায় যে, সমসাময়িক চের রাজা স্থানুরবির সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল। আদিত্য নিজে পল্লব রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, কিন্তু স্থানুরবির কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্র পরান্তকের বিবাহ দেন। চিত্তুর জেলায় কালহস্তির নিকট তোণ্ডাইমানাদে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রথম পরান্তক এখানে একটি মন্দির

নির্মাণ করেন। এই মন্দিরটি আদিত্যেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। একে চোল আমলে রাজপদের উপর দেবত্ব আরোপের অন্যতম নিদর্শন বলা যায়। আদিত্য নিজে শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং বলা যায় যে, বিজয়ালয় এবং তাঁর পুত্র উভয়েই পরম শৈব ছিলেন।

শ্রীপুরম্বিয়মের যুদ্ধের সময় চোলগণ পল্লবদের অধীন তাঞ্জোর এবং উরাইয়ুরসহ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি মাত্র ছিল। কিন্তু মাত্র পঁচিশ বৎসরের মধ্যে চোলগণ একটি বিস্তৃত অঞ্চলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। এই কৃতিত্ব অবশ্যই দক্ষ যোদ্ধা ও কূটনীতিবিদ প্রথম আদিত্যর প্রাপ্য। তৎকালীন পরিস্থিতি তাঁকে সাহায্য করেছিল এবং তিনি এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। পাণ্ড্যগণ তখন অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। গঙ্গাগণ তাঁকে সাহায্য করেছিল। উপরন্তু বাণগণ, বৈদুম্বগণ, গংগাগণ এবং নোলম্ব-গণের পারস্পরিক সংঘর্ষের সুযোগও তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রথম আদিত্যর পুত্র, প্রথম পরান্তক ৪৮ বৎসর (৯০৭-৯৫৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তাঁর এই দীর্ঘ রাজত্বকালের বেশির ভাগ সাফল্য ও সমৃদ্ধির জন্য স্মরণীয়। অবশ্য শেষ দিকে তিনি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর পিতার সাফল্যের ধারা অনুসরণ করে ঐ রাজ্যের স্বাধীনতার অবসান ঘটান। এর ফলে চোল রাজ্যের সীমা কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। তিনি সিংহল আক্রমণ করেন, কিন্তু এই আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। অন্যত্র তিনি বাণদের পরাজিত করেন। গঙ্গা রাজা হস্তিমল তাঁর আধিপত্য মেনে নেন। পল্লব অধিকারের শেষ চিহ্ন তাঁর সময় অবলুপ্ত হয়। তিনি উত্তরে নেল্লোর পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা প্রসারিত করেন। তাঁর রাজত্বের অন্তিম লগ্নে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। এর ফলে যে যুদ্ধ হয়, তাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাদিত্যের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার অল্পকাল পরে প্রথম পরান্তক মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে তিন দশকেরও বেশি সময়ের জন্য চোল রাজ্য দুর্দৈবের সম্মুখীন হয়। অবশেষে ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত প্রথম রাজরাজের সিংহাসন আরোহণের ফলে এই দুর্যোগের সমাপ্তি ঘটে।

প্রথম পরান্তক সিংহাসন লাভের অল্পকাল পরে পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে তিনি 'মাদুরাইকোণ্ড' অভিধা গ্রহণ করেন। কোন আকস্মিক আক্রমণের ফলে পাণ্ড্য রাজ্যের পতন হয়নি। এই রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। এই রাজ্যে তাঁর প্রথম যে শিলালিপিটি পাওয়া গেছে, সেটি তাঁর রাজত্বের ত্রয়োদশতম বৎসরের। মহাবংশ থেকে এই অভিযানের তিনটি পর্যায়ের কথা জানা যায়। প্রথম পর্যায়ে পাণ্ড্য রাজা রাজসিংহ পরাজিত হন। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজসিংহ সিংহলের রাজা পঞ্চম

কশ্যপের (৯১৩-৯২৩ খৃষ্টাব্দ) সাহায্য লাভ করেন। কিন্তু যুদ্ধে উভয় সেনা-বাহিনী পরাজিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে সিংহলের সেনাপতি অভিযান পরিচালনা করেন এবং ব্যর্থ হন। প্রথম পরান্তকের লেখগুলি মোটামুটিভাবে এই বিবরণ সমর্থন করে। তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরের দুইটি লেখতে বেল্লুরের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই যুদ্ধে পাণ্ড্য এবং সিংহলী বাহিনী পরাজিত হয়েছিল। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে প্রথম পরান্তকের পক্ষে ধীরে ধীরে পাণ্ড্য রাজ্য জয় এবং অধিকার করা সম্ভব হয়েছিল। চোল আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে রাজসিংহ সিংহলে যান, কিন্তু সেখানে আশানুরূপ সাড়া না পাওয়ায় তিনি তাঁর রাজমুকুট সিংহলে রেখে, তাঁর মায়ের রাজ্য, কেরলে আসেন। কেরল রাজাদের সঙ্গে তখন চোল রাজাদের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজসিংহ নিরুপায় হয়ে সেখানে এসেছিলেন। পাণ্ড্য রাজ্যের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের শেষ দিকে প্রথম পরান্তক মাদুরায় রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে শত্রু রাজ্যের রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সিংহল থেকে তাঁর এই মুকুট উদ্ধারের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। অনেকদিন পরে তাঁর বংশধর প্রথম রাজেন্দ্র এই ব্যর্থতার গ্লানি দূর করেছিলেন।

পাণ্ড্য যুদ্ধের বিরতির সময় প্রথম পরান্তক অন্যত্র তাঁর অধিকার সম্প্রসারিত করেছিলেন। সোলিঙ্গুর-র শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি গঙ্গা দ্বিতীয় পৃথিবীপতিকে 'বাণাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং বল্লালের যুদ্ধে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। উদয়েন্দিরম পট্ট থেকে জানা যায় যে তিনি দুইজন বাণ রাজার উচ্ছেদসাধন এবং বৈদুম্বগণকে পরাজিত করেছিলেন। যে দুইজন বাণ রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরা হয়ত ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য এবং তৃতীয় বিজয়াদিত্য। সুতরাং দ্বিতীয় পৃথিবীপতির 'বাণাধিরাজ' অভিধা বাগাড়ম্বর মাত্র ছিল না। বাণরাজাদের এই উচ্ছেদসাধন, পরবর্তীকালে চোল রাজ্যের উপর রাষ্ট্রকূট রাজ তৃতীয় কৃষ্ণের সফল আক্রমণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করার আগে প্রথম পরান্তকর সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের পূর্ব সম্পর্কের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথম পরান্তকর রাজত্বের গোড়ার দিকে রাষ্ট্রকূট রাজা দ্বিতীয় কৃষ্ণ চোল সিংহাসনে নিজের দৌহিত্রকে স্থাপন করার জন্য চোল রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন। রাষ্ট্রকূটদের অধীন সামন্তরূপে বাণগণ তাঁর পক্ষে ছিল। অন্যদিকে দ্বিতীয় পৃথিবীপতি ছিলেন চোলদের পক্ষে। ৯১০-১১ খৃষ্টাব্দে দুই প্রতিপক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত বল্লালের যুদ্ধে দ্বিতীয় কৃষ্ণ চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়েছিলেন। বীর রাজেন্দ্রর কন্যাকুমারী লেখ থেকে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে জয়লাভের পরে প্রথম পরান্তক 'বীর-চোল' আখ্যা লাভ করেছিলেন। এই যুদ্ধের পরে তিনি

Scanned with CamScanner

বাণদের পূর্বোক্ত শাস্তিবিধান করেছিলেন।

৯৪০ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রথম পরান্তকর কাছে রাজ্য রক্ষার সমস্যা ক্রমশ বড় হয়ে দেখা দেয়। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনায় এই ছিল স্বাভাবিক। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র চোল রাজ্য একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে এ জন্য অশেষ মূল্য দিতে হয়েছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই চোল রাজ্যের প্রতি তাদের মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। রাষ্ট্রকূটগণ এবং পূর্ব চালুক্যগণও চোল রাজ্যের অগ্রগতি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেনি। ৯৪০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি দ্বিতীয় পৃথিবীপতির মৃত্যুর পরে গঙ্গারাজ্যের সঙ্গে চোলদের পূর্ব সম্পর্ক বিশেষভাবে ক্ষুন্ন হয়েছিল। এই রাজ্যের নতুন শাসক হয়েছিলেন দ্বিতীয় বুতুগ। তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণর ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন। বাণ এবং বৈদুম্বগণ চোলদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকূটদের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। এই অবস্থায় তরুণ রাজা তৃতীয় কৃষ্ণ প্রথম সুযোগে দক্ষিণ দিকে অভিযান পাঠাতে দ্বিধা করেন নি। প্রথম পরান্তক তাঁর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণের এই সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাদিত্যকে যথেষ্ট সৈন্যসহ সেখানে পাঠিয়েছিলেন। ৯৪৯ খৃষ্টাব্দে উত্তর আর্কট জেলার অন্তর্গত তাক্কোলামের যুদ্ধে চোলগণ পরাজিত এবং রাজাদিত্য নিহত হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় কৃষ্ণর বিরুদ্ধে চোল প্রতিরোধ শেষ হয়নি। নিজেকে দৃঢ়ভাবে দাক্ষণে প্রতিষ্ঠিত করার আগে তৃতীয় কৃষ্ণকে আরও কয়েক বৎসর সেখানে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চোল সাম্রাজ্যের উত্তর ভাগের বৃহৎ অংশের উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি সংগতভাবে 'কাঞ্চী-তাঞ্জোর-কোণ্ড' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। চোলদের অধীন সামন্তগণ এই সুযোগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। সুতরাং চোল সাম্রাজ্যের উপর তৃতীয় কৃষ্ণর আক্রমণের ফল, চোল সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক হয়েছিল। উত্তর দিকে প্রবল আঘাতের ফলে, দক্ষিণেরও ব্যাপক অংশ চোলদের হাত ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত চোল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব আর ছিল না। পরে আবার নতুন করে একে গড়ে তুলতে হয়েছিল।

জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও, প্রথম পরান্তক শান্তির কাজ অবহেলা করেন নি। কৃষির উন্নতির জন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র জলসেচ প্রণালী নির্মাণ করেছিলেন। বিভিন্ন ভাবে ভূমিদানও তিনি করেছিলেন। চিদাম্বরমের শিব মন্দিরটি তিনি আগাগোড়া সোনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। মন্দির স্থাপত্যে তাঁর কীর্তি কম ছিল না। তাঁর বিভিন্ন লেখ থেকে তৎকালীন ধর্ম ও রাষ্ট্র বিন্যাস বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যায়।

প্রথম পরান্তকর মৃত্যুর পরবর্তী ত্রিশ বৎসর (৯৫৫-৯৮৫) চোলদের

ইতিহাস নানা দুর্যোগে আকীর্ণ। পরান্তকর অব্যবহিত পরে রাজা হন তাঁর পুত্র গণ্ডরাদিত্য। রাজনীতির চেয়ে ধর্মে তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল। ৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তৃতীয় কৃষ্ণ তখনও তোণ্ডাইমণ্ডলমের অধীশ্বর ছিলেন। গণ্ডরাদিত্যর ভাই অরিঞ্জয় অল্পকাল রাজত্ব করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র সুন্দর চোল রাজা হন। তিনি দক্ষিণের বীর পাণ্ড্যকে দুইটি যুদ্ধে পরাজিত করেন। ৯৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর সৈন্যদল সিংহল আক্রমণ করে। কিন্তু এর ফলে সিংহলের উপর চোল অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। উত্তর দিকে তিনি অধিকতর সাফল্য অর্জন করেন। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে গণ্ডরাদিত্যর পুত্র উত্তম চোল রাজা হন (৯৭৩ খৃষ্টাব্দ)। তত দিনে রাষ্ট্রকূটদের হাত থেকে তোণ্ডাইমণ্ডলমের বেশির ভাগ চোলগণ পুনরুদ্ধার করেছিল। অবশ্য ৯৮০ খৃষ্টাব্দে চালুক্য রাজা দ্বিতীয় তৈল উত্তম চোলকে পরাজিত করেছিলেন।

৯৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজরাজের সিংহাসন প্রাপ্তি থেকে চোল সাম্রাজ্যের প্রকৃত গৌরবের সূচনা হয়েছিল। সুন্দর চোলের পুত্র রাজরাজের (৯৮৫-১০১৪ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে চোলদের ইতিহাসে শতাব্দী-কালব্যাপী গৌরবের সূচনা হয়। তিনি ছিলেন বিজয়ালয় প্রবর্তিত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রাজেন্দ্র চোলের গৌরবময় সাফল্যের ভিত্তি তিনিই স্থাপন করেছিলেন। রাজরাজের ত্রিশ বৎসরের শাসনকে চোল রাজতন্ত্রের গঠন-কাল বলা যায়। সরকার ও সেনা বাহিনীর সংগঠনে, শিল্পে ও স্থাপত্যে, ধর্মে ও সাহিত্যে, এই যুগে স্মরণীয় কীর্তি অর্জিত হয়েছিল। রাজরাজ যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন চোলরাজ্য ছিল আয়তনে ক্ষুদ্র। রাষ্ট্রকূট আক্রমণের প্রভাব তখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। রাজরাজ এই ক্ষুদ্র ও ক্ষতচিহ্ন লাঞ্ছিত চোল রাজ্যকে একটি বিস্তৃত, সুসংগঠিত, সুশাসিত, ধনৈশ্বর্য এবং সেনাবাহিনী ও নৌবল সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যে পরিণত করেন।

রাজরাজ তাঁর সমরাভিযানের সূচনায় পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য এবং সিংহলের মিলিত শক্তিকে আক্রমণ করেন। রাজরাজই ছিলেন প্রথম তামিল রাজা, যিনি তাঁর প্রস্তর লেখগুলির ভূমিকা হিসাবে তাঁর রাজত্বকালের প্রধান ঘটনাবলী লিপি-বদ্ধ করেছিলেন। এই উপাদান থেকে জানা যায় যে, তিনি দুইটি অভিযানে পাণ্ড্যদের ধ্বংস এবং কেরলের উদ্ধত রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। নৌ-হরের সাহায্যে তিনি সিংহল আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে সিংহলের রাজা পঞ্চম মহেন্দ্র দ্বীপটির দক্ষিণ-পূর্বে, পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। রাজরাজ সিংহলের রাজধানী অনুরাধপুর ধ্বংস করেন এবং পোলন্নরুবতে সিংহলস্থ চোল প্রদেশের নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। ইতিপূর্বে তামিল রাজারা সিংহল আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আক্রমণের সঙ্গে চোল

Scanned with CamScanner

আক্রমণের মৌলিক পার্থক্য ছিল। পূর্ববর্তী রাজারা সিংহলরাজের বশ্যতা আদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চোলদের উদ্দেশ্য ছিল অনেক ব্যাপক। তাঁরা সমগ্র সিংহল জয় করতে চেয়েছিলেন। রাজরাজের একাধিক লেখ সিংহলে পাওয়া গেছে। সম্ভবত তিনি সিংহল অধিকারকে স্মরণীয় করার জন্য নতুন রাজধানীতে একটি পাথরের শিবমন্দির নির্মাণ করেন। সিংহলে মৃত্তিকাময় হিন্দু স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে সুরক্ষিত এই মন্দিরটি অন্যতম।

রাজরাজ অন্যদিকে মহীশূরের অন্তর্গত গঙ্গপাড়ি, নোলম্বপাড়ি এবং তড়িগৈপাড়ি আক্রমণ ও তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আপাতদৃষ্টিতে এই অভিযানের লক্ষ্যস্থল মহীশূর হলেও, প্রকৃতপক্ষে রাজরাজ তাঁর প্রধান শত্রু, গঙ্গারাজ্যের বিরুদ্ধে এই অভিযান করেছিলেন। এর ফলে গঙ্গারাজ্যের উপর চোল অধিকার শতাব্দী কালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনুমান করা হয় যে, গঙ্গারাজ্যের অধীন নোলম্বগণ এই অভিযানে চোলদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। গঙ্গারাজ্যের বিরুদ্ধে রাজরাজের সহজ সাফল্যের আরও একটি কারণ ছিল। সেটি হল ৯৭৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি রাষ্ট্রকূট শক্তির অবসান। একথা ঠিক যে সেই সময় দ্বিতীয় তৈলের কল্যাণে চালুক্য শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে গঙ্গারাজ্যের যে মৈত্রী সম্পর্ক ছিল, সেই ধরণের সম্পর্ক চালুক্যদের সঙ্গে ছিল না। তাই এই রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রকূট সম্পর্করহিত গঙ্গারাজ্য নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিল। তবে পশ্চিমের চালুক্যগণ রাজরাজের নেতৃত্বে চোলদের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত ছিল না, এমন নয়। ৯৯২ খৃষ্টাব্দের একটি লেখতে দ্বিতীয় তৈল চোলদের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্যের দাবি করেছিলেন।

দ্বিতীয় তৈলের পুত্র সত্যাশ্রয়ের রাজত্বকালে পশ্চিম চালুক্যগণের সঙ্গে রাজরাজের প্রকৃত বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। রাজরাজের পরবর্তীকালের লেখগুলি থেকে জানা যায় যে, তিনি সত্যাশ্রয়ের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য দ্বারা তাঞ্জোর মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করেছিলেন। সত্যাশ্রয়ের বিরুদ্ধে এই অভিযানের নেতা ছিলেন যুবরাজ রাজেন্দ্র। সত্যাশ্রয়কে মালবের পরমারগণের শত্রুতারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সত্যাশ্রয় প্রথমে এই দ্বিমুখী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি। ১০০৩ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু করে একাধিক লেখতে বলা হয়েছে যে, রাজরাজ রত্নপাড়ি দখল করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যাশ্রয় চোল আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন। রত্নপাড়িতে চোল অধিকারের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

উত্তর-পশ্চিমে রাজরাজের অভিযানের যে বর্ণনা এতক্ষণ দেওয়া হল, তার ফলে মহীশূরের গঙ্গা-নোলম্ব অধিকৃত অঞ্চল এবং সমগ্র বেলারি জেলা চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইভাবে চোলদের সাম্রাজ্য সীমা তুঙ্গভদ্রা

পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। একথা ঠিক যে, বেলারিতে রাজরাজের কোন লেখ পাওয়া যায় নি। তবে রাজরাজের রাজত্বের শেষ দিকে গঙ্গা এবং বেঙ্গি মণ্ডলের জন্য তাঁর একজন মহাদণ্ডনায়ক ছিলেন। এ থেকে এই দিকে তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলে তখন পশ্চিম চালুক্যগণ এবং পূর্ব উপকূলে, পূর্ব চালুক্যগণ রাজত্ব করত। এই পূর্ব চালুক্যদের প্রধান কেন্দ্র ছিল বেঙ্গি। রাজরাজের পক্ষে পশ্চিম চালুক্যদের তুলনায়, পূর্ব চালুক্যদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সহজ হয়েছিল। কেননা দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকার জন্য বেঙ্গি জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অপর দিকে পশ্চিম চালুক্যগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রকূটদের অধীনে থাকার পরে, দ্বিতীয় তৈলের নেতৃত্বে সদ্য নবজীবন লাভ করেছিল। বেঙ্গি শুধু জীর্ণ হয়ে যায় নি, সিংহাসনে অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অরাজকতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। রাজরাজ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে বেঙ্গি রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। পূর্ব দাক্ষিণাত্যে চোল অধিকারের এই অগ্রগতি সহ্য করতে না পেরে সত্যাশ্রয় ১০০৬ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গি আক্রমণ করেন। আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বিবেচনা করে ১০০৭ খৃষ্টাব্দে রাজরাজ রাজেন্দ্রকে পশ্চিম চালুক্য রাজ্য আক্রমণের আদেশ দেন। রাজেন্দ্র সৈন্যসহ বিজাপুর জেলার দোনুর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি বনবাসি এবং রাইচুর দোয়াবের অনেকাংশও অধিকার করেন। তাছাড়া তিনি মান্যখেত পুড়িয়ে দেন। এই অবস্থায় সত্যাশ্রয় বেঙ্গি থেকে তাঁর সেনাবাহিনী অপসারণ করতে বাধ্য হন এবং কোনক্রমে তাঁর রাজ্যকে চোল বাহিনীমুক্ত করেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সহ চোল সৈন্যদল তুঙ্গভদ্রার অপর তীরে প্রত্যাবর্তন করে।

সামরিক দিক থেকে রাজরাজের শেষ উল্লেখযোগ্য সাফল্য হল ১২০০০ দ্বীপ অথবা মালদিব বিজয়। এই নৌ-বিজয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে এ থেকে বোঝা যায় যে, কয়েক বৎসর পরে রাজেন্দ্র চোল নৌবহরের যে বহুল ব্যবহার করেছিলেন, তার প্রস্তুতি পর্ব রাজরাজের সময় সমাপ্ত হয়েছিল। এদিক থেকে তাঁর সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের সম্পর্ক, অনেকটা ম্যাসিডনের ইতিহাসে ফিলিপের সঙ্গে আলেকজান্ডারের সম্পর্কের মত। ইতিপূর্বে রাজরাজের সিংহল বিজয়েও নৌবহর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। রাজরাজ নৌবহরের গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। মনে হয় তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে কান্ডালুরের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠিয়ে তিনি চেরদের নৌবহরকে খর্ব করতে চেয়েছিলেন।

১০১২ খৃষ্টাব্দে রাজরাজ রাজেন্দ্র চোলকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

Scanned with CamScanner

১০১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঞ্জোরের প্রখ্যাত রাজরাজেশ্বর শিব মন্দির তাঁর স্মরণীয় রাজত্বের উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যে এর সঙ্গে তুলনীয় কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বিজিত রাজ্যগুলিকে অবশ্যই এই মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করতে হয়েছিল। মন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ হওয়ার পরেও অসংখ্য গ্রামকে এই মন্দিরের প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিক এবং দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে হত। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে রাজরাজ এই মন্দির বিষয়ক সব আয়োজন শেষ করেছিলেন। সুতরাং এই মন্দিরকে তাঁরই নীতির সৃষ্টি বলা যায়।

ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের জন্য ব্যাপকভাবে জমি জরিপ করা, সচিব শ্রেণীর কর্মচারি নিয়োগ, বিভিন্ন স্থানে যোগ্য কেন্দ্রীয় কর্মচারি প্রেরণ, গ্রামসভা এবং অন্যান্য স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধিকার রক্ষা করে তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, স্থায়ী সৈন্যদল গঠন এবং নৌবহর সৃষ্টি ইত্যাদি কাজের জন্য রাজরাজকে দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য নির্মাতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়।

রাজরাজ নিজে ছিলেন পরম শৈব। কিন্তু তিনি পরমত সহিষ্ণু ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী তাঁর কাছ থেকে সমান অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঞ্জোর মন্দিরের ভাস্কর্য এবং বিষ্ণু মন্দিরগুলি, তাঁর ধর্মীয় উদারতার স্মারক। তিনি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা শ্রী-মার-বিজয়োত্তুঙ্গ বর্মণকে নেগাপতমে বিহার নির্মাণে উৎসাহ দিয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার পিতার নামানুসারে এই বিহারের নাম হয়েছিল চূড়ামণি বিহার। বুদ্ধের উদ্দেশে নিবেদিত এই বিহারের জন্য রাজরাজ একটি গ্রাম দান করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকাল ১০১২-১০৪৪ খৃষ্টাব্দ। এর মধ্যে প্রথম দুই বৎসর তিনি পিতার সঙ্গে যুগ্মভাবে রাজত্ব করেন। রাজেন্দ্র চোল উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য লাভ করেন। সমগ্র তামিলনাদ এবং অন্ধ্র, তৎসহ মহীশূর ও সিংহলের অংশ বিশেষ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একটি সুগঠিত রাষ্ট্রবিন্যাস, শক্তিশালী আমলাতন্ত্র, সুসজ্জিত সেনাবাহিনী ও নৌবহর তিনি রাজরাজের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই সেনাবাহিনী সীমান্ত ও অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার অস্ত্র হিসাবে কাজ করত। নৌবহরের সাহায্যে সিংহল, মালদিভ প্রভৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্য, দুই-ই সুরক্ষিত হত। রাজেন্দ্র চোল তাঁর সম্পদ ও সুযোগের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। এর ফলে তাঁর সময় চোল সাম্রাজ্য, হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে, আয়তনে ও মর্যাদায়, সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথমার্ধ যুদ্ধ এবং রাজ্য জয়ে ব্যয়িত হয়েছিল। তিনি তাঁর প্রস্তর লেখগুলিতে এবং তিরুবালঙ্গারু ও করণদাই (তাঞ্জোর) তাম্রপট্টে জলে স্থলে তাঁর যুদ্ধাভিযানের নির্ভরযোগ্য বিবরণ রেখে গেছেন। তাঁর সম্পর্কিত

অন্যান্য উপাদানে এই বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। এই উপাদানের মধ্যে রাজেন্দ্র চোল সম্পর্কিত তামিল ও সংস্কৃত প্রশস্তির উল্লেখ করা যায়। কবি নারায়ণ রচিত সংস্কৃত প্রশস্তি উচ্চ সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ এবং তামিল প্রশস্তির উত্তম পরিপূরক।

রাজেন্দ্র চোল তাঁর রাজত্বের সপ্তম বৎসরে অন্যতম পুত্র রাজাধিরাজকে "যুবরাজ" নিযুক্ত করেন। তাঁর রাজত্বের বাকি পঁচিশ বৎসর সাম্রাজ্যের ভার, পিতা-পুত্র মিলিতভাবে বহন করেন। রাজাধিরাজ জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না। সুতরাং যোগ্যতা বলেই তিনি যুবরাজের সম্মান লাভ করেছিলেন। অন্যান্য পুত্রগণও বয়ঃপ্রাপ্ত হলে বিভিন্ন উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। রাজেন্দ্র চোল এইভাবে যেমন একদিকে সিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের সম্ভাবনা দূর করতে চেয়েছিলেন, তেমন অন্যদিকে রাজপুত্রদের সন্তোষবিধান ও রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের লেখতে বনবাসি এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্যের উল্লেখ আছে। মনে হয় তাঁর পিতার রাজত্বকালের শেষভাগে এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। সম্রাট হিসাবে রাজেন্দ্র চোলের প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য, সিংহল অভিযান। তাঁর রাজত্বের পঞ্চম বৎসরের কয়েকটি লেখতে, এই অভিযানের উল্লেখ নেই, আবার কয়েকটিতে, আছে। সুতরাং পঞ্চম বৎসরে এই অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছিল, বলা যায়। রাজেন্দ্র চোলের লেখতে এই অভিযানের বিশদ বর্ণনা নেই। কিন্তু সিংহলী ইতিবৃত্ত, মহাবংশে আছে। তা থেকে জানা যায় যে, রাজরাজ যে সিংহল বিজয় আরম্ভ করেন, রাজেন্দ্র তা শেষ করেন। যুদ্ধে সিংহলরাজ পঞ্চম মহেন্দ্র বন্দী হন এবং চোল রাজ্যে স্থানান্তরিত হয়ে আরও বারো বৎসর বাঁচেন। সিংহলে রাজেন্দ্র চোলের কয়েকটি লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখগুলি ভগ্ন হওয়ায় সেগুলি থেকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। সেগুলি রাজেন্দ্রর সিংহল অধিকার প্রমাণিত করে মাত্র। সিংহলের কয়েকটি শিব ও বিষ্ণু মন্দির সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। রাজেন্দ্র সমগ্র সিংহলকে চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশে পরিণত করেন। তবে রাজেন্দ্র চোল দীর্ঘকাল সমগ্র সিংহলের উপর তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। মহাবংশে বলা হয়েছে যে, পঞ্চম মহেন্দ্রর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কশ্যপকে কেন্দ্র করে আবার জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে ওঠে এবং ছয় মাস যুদ্ধের পর তিনি সিংহলের দক্ষিণাংশের রাজা হন এবং প্রথম বিক্রমবাহু নামে বারো বৎসর এই অঞ্চল শাসন করেন।

তিরুবালঙ্গারু পট্টে বলা হয়েছে যে, এর পরে, অর্থাৎ ষষ্ঠ বৎসরে, রাজেন্দ্র দিগ্বিজয়ে বের হন এবং তাঁর সৈন্যদল বিজয়গর্বে পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য অতিক্রম করে। তবে এই অভিযানের ফলে রাজেন্দ্র কোন নতুন অঞ্চল লাভ করেছিলেন

কিনা সন্দেহ। আরব বণিকগণ তখন ভারতের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা কেরলের শাসকবর্গের সমর্থন লাভ করেছিল। চোল রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যে আরবদের প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং মালাবারের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে, এই প্রতিযোগিতার মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। আরবদের বাণিজ্যে মালদিবের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাজরাজ এর উপর নৌ-আক্রমণ চালিয়েছিলেন। চোলগণ আরব বাণিজ্যকে সরাসরি আঘাত করতে না পারলেও, সিংহলে ব্যাপক ধ্বংসকার্য চালিয়েছিলেন। রাজরাজ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্য জয় করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে তিনি আরব সাগরে মালদিব জয় করেন। পাণ্ড্য রাজ্যের অসংখ্য লেখ থেকে জানা যায় যে, রাজরাজ শেষ পর্যন্ত দক্ষিণের বিজিত রাজ্যগুলির উপর তাঁর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। তাই মনে হয়, এই অঞ্চলে রাজেন্দ্র চোলের ভৌগোলিক দিক থেকে নতুন কোন লাভের সম্ভাবনা ছিল না। তবে রাজেন্দ্র চোলের দশম বৎসরের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর অন্যতম পুত্রকে 'চোল-পাণ্ড্য" আখ্যা দিয়ে মাদুরার শাসক নিযুক্ত করেন। এই লেখতে আরও বলা হয়েছে যে রাজেন্দ্র মাদুরায় একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

১০২১-২২ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলকে পশ্চিম চালুক্যগণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুনরায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। এখানে রাজেন্দ্র চোলের সমকালীন শাসক ছিলেন দ্বিতীয় জয়সিংহ। তাঁর অন্যতম শত্রু ছিলেন মালবের পরমার বংশীয় ভোজ। রাজেন্দ্র চোল তাঁর পক্ষে অধিকতর বিপদের কারণ হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে সত্যাশ্রয়ের সময় পশ্চিম চালুক্যগণের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, দ্বিতীয় জয়সিংহ তা পূরণ করতে চেয়েছিলেন। রাজেন্দ্র চোল সিংহল বিজয় এবং পাণ্ড্য-কেরল রাজ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পরিস্থিতি জয়সিংহের অনুকূলে ছিল। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে বিমলাদিত্যের অবসর গ্রহণ অথবা মৃত্যু হওয়ার ফলে বেঙ্গির সিংহাসন শূন্য হয়েছিল। এই সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় জয়সিংহের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের বিরোধ ঘটেছিল। বিমলাদিত্যের দুই বংশধর এই সিংহাসনের দাবিদার ছিলেন। একজন ছিলেন বিজয়াদিত্য এবং অন্যজন, রাজরাজ। রাজরাজ চোল মহিষী কুন্দবাঈয়ের সন্তান হওয়ায়, রাজেন্দ্র চোলের সমর্থন লাভ করেছিলেন। বিজয়াদিত্যের পক্ষে ছিলেন, দ্বিতীয় জয়সিংহ। তিনি বিজয়াদিত্য সম্পর্কিত তাঁর পরিকল্পনা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করে বেলারি এবং হয়ত গঙ্গবাদির অংশবিশেষ অধিকার করেন। বেঙ্গিতে বিজয়াদিত্য বেজওয়াদা অধিকার করে রাজরাজের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে বাধা দেন। রাজেন্দ্র চোল তখন দ্বিতীয় জয়সিংহের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তাঁর একটি সেনাবাহিনী রায়চুর

দোয়াবে অবতীর্ণ হয়। আর একটি বাহিনী রাজরাজের সাহায্যকল্পে বেঙ্গিতে আসে। পশ্চিমদিকে, মাস্কিতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে দ্বিতীয় জয়সিংহ পরাজিত হন। কিন্তু রাজেন্দ্র চোল এদিকে আর অগ্রসর না হয়ে, তুঙ্গভদ্রাকে তাঁর সাম্রাজ্যের সীমান্ত হিসাবে মেনে নেন। বেঙ্গিতে চোল বাহিনী কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়াদিত্যকে পরাজিত এবং রাজরাজের হয়ে বেঙ্গি অধিকার করে। এর পরে চোল বাহিনী, কলিঙ্গের পূর্ব গঙ্গা বংশীয় শাসক, জয়সিংহের পক্ষ অবলম্বন করায়, তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। তাঁর শান্তিবিধানের পর এই বাহিনী, আরও উত্তরে, গাঙ্গেয় উপত্যকা অভিযানে অগ্রসর হয়।

ইতিপূর্বে পাল রাজা মহীপাল প্রসঙ্গে এই অভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই অভিযানে দুই বৎসরেরও কম সময় ব্যয় করা হয়েছিল এবং উত্তর ভারতের অনেকগুলি রাজ্য এর সম্মুখীন হয়েছিল, এই দুইটি বিষয় মনে রাখলে, এই অভিযানকে একটি দ্রুত হানার চেয়ে অধিকতর মর্যাদা দেওয়া যায় না। রাজেন্দ্র চোলের একজন মাত্র সেনাপতি এর নেতৃত্ব করেছিলেন। এই অভিযানে ইন্দ্ররথ, রনসুর, ধর্মপাল, মহীপাল ইত্যাদি নরপতি পরাজিত হয়ে চোল রাজের জন্য গঙ্গার জল বহন করে এনেছিলেন। অভিযান প্রত্যাগত সেনাপতি রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে গোদাবরী তীরে মিলিত হয়েছিলেন। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, বেঙ্গি রাজ্য, রাজরাজের সময় যেমন, রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালেও তেমন, চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অধীনতামূলক মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল।

এই বর্ণনায় গঙ্গাজল বহনের কাহিনী হয়ত অতিরঞ্জিত, কিন্তু মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সন্দেহের অতীত। অনেকে এই অভিযানকে গঙ্গানদীতে তীর্থযাত্রা হিসাবে দেখে এর গুরুত্বকে লঘু করতে চেয়েছেন। গঙ্গাজল আনা হয়ত এই অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাই দিয়ে মূল উদ্দেশ্যকে আচ্ছন্ন করা ঠিক নয়। রাজেন্দ্র চোল এই অভিযানের সাহায্যে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির সামনে তাঁর সামরিক শক্তির নিদর্শন রাখতে চেয়েছিলেন। অভিযান শেষে তিনি তিরুচিরাপল্লী জেলায় প্রতিষ্ঠিত নতুন রাজধানী, গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে ফিরে এসেছিলেন।

রাজেন্দ্র চোলের এই অভিযান বাঙলা দেশে স্থায়ী চিহ্ন রেখেছিল। রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর সঙ্গে কিছু সংখ্যক কর্ণাট নরপতি পশ্চিম বাঙলায় এসেছিলেন। তাঁদেরই অন্যতম বংশধর সামন্তসেন সেন বংশের পত্তন করেন। তাছাড়া রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীর থেকে শৈবদের এনে তাঁদের কাঞ্চীপুরমে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অল্পকাল পরে রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে একটি বৃহৎ নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। শ্রী বিজয় ছিল একটি সামুদ্রিক রাষ্ট্র। মালয় উপদ্বীপ,

Scanned with CamScanner

সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং অন্যান্য সংলগ্ন দ্বীপগুলি এর অধীন ছিল। এই রাষ্ট্রটি ভারত ও চীনের মধ্যে সমুদ্র পথ নিয়ন্ত্রণ করত। রাজরাজের সময় এবং রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের প্রথম দিকে চোলদের সঙ্গে শ্রীবিজয়ের সদ্ভাব বজায় ছিল। দক্ষিণ ভারতের চোল সাম্রাজ্যের সঙ্গে চীনের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই দ্বীপগুলির নিত্য সম্পর্ক ছিল। শ্রীবিজয়ের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা কর্তৃক নেগাপতমে চূড়ামণি বিহার নির্মাণ একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। এর মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে এই দ্বীপগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক উদ্ঘাটিত হয়েছিল। এই বাণিজ্য ছিল পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে চীনের বৃহত্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যের একটি অংশ। আরবগণ, ভারতীয়গণ এবং এই দ্বীপগুলির বাসিন্দাগণ এই বাণিজ্যে মধ্যস্থ হিসাবে অংশ গ্রহণ করত। নবম শতাব্দীতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের পর দশম শতাব্দীতে চীনের সরকার এই বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং বিদেশে বাণিজ্য দূত পাঠান। ১০০৩ ও ১০০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীবিজয় থেকে বাণিজ্য দূত চীনে যান। একাদশ শতাব্দীতে চোল রাজ্য থেকে একাধিক বাণিজ্য অথবা কূটনৈতিক দূত চীনে যান। এই পটভূমিতে রাজেন্দ্র চোল ১০২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীবিজয়ের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান।

রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে শ্রীবিজয়ের বিরোধের প্রকৃত কারণ কী ছিল, জানা যায় না। এমন হতে পারে যে চোলদের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্যের পথে শ্রীবিজয় অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। অথবা রাজেন্দ্র চোল সমুদ্র পরবর্তী অঞ্চলে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। উদ্দেশ্য যাই হক, এই অভিযান সম্পূর্ণ জয়-যুক্ত হয়েছিল। শ্রীবিজয়ের রাজধানী অগ্নিদগ্ধ হয়েছিল এবং রাজা বন্দী হয়েছিলেন। অবশ্য বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে রাজেন্দ্র চোল বিজিত রাজাকে স্বরাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয়কে তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রদেশে পরিণত করেন নি। সুতরাং এই অভিযানের কোন নির্দিষ্ট এবং স্থায়ী ফল হয়েছিল, একথা বোধ হয় বলা যায় না। ১০৮৮ খৃষ্টাব্দের যে তামিল লেখটি সুমাত্রায় পাওয়া গেছে, তাতে শুধু মাত্র তামিল ব্যবসায়ীদের সেখানে উপস্থিতির কথা জানা যায়।

তাঞ্জোর পট্টে কম্বুজ রাজের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের যোগাযোগের কথা আছে। কম্বুজ ছিল ইন্দো-চীনের অন্তর্কোর রাজ্যের নাম। সমুদ্র পরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে রাজেন্দ্র চোলের যোগাযোগের চিহ্ন হিসাবে এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীবিজয় অভিযানের পরে রাজেন্দ্র চোল প্রায় কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, এই সময় রাজ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তাঁর পরের, বিশেষত রাজাধিরাজের লেখগুলি থেকে এই ধারণা ভ্রান্ত

প্রতিপন্ন হয়েছে। এই সময় পাণ্ড্য রাজ্য, কেরল এবং সিংহলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। প্রথম দুইটি ক্ষেত্রে রাজাধিরাজকে বিদ্রোহী রাজাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল। পাণ্ড্য রাজ্য এবং কেরল জয়ের এতদিন পরেও সেখানে স্থানীয় রাজা ছিলেন এবং তাঁরা প্রবল পরাক্রান্ত চোল রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সাহসী হয়েছিলেন, এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, চোল সাম্রাজ্যবাদ মোটেই নির্মম ছিল না। রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে রাজাধিরাজ সিংহল আক্রমণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় এই সমস্যার সমাধান হয়নি।

রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বের শেষ দিকে তিনি আবার পশ্চিম চালুক্যগণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং বেঙ্গি অনিবার্যভাবে এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। ১০৪২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়সিংহের মৃত্যু হলে প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল পশ্চিম চালুক্য রাজ্যের রাজা হন। তিনি বেঙ্গি আক্রমণ করলে চোল শক্তির সঙ্গে তাঁর সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১০২২ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গির সিংহাসন লাভের পর রাজরাজ নিরুপদ্রবে থাকতে পারেন নি। তাঁর সৎভাই বিজয়াদিত্য সিংহাসন লাভের জন্য সংগ্রাম পুনরায় শুরু করেন এবং ১০৩১ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বিজয়াদিত্য নামে সিংহাসনে বসেন। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজরাজ সিংহাসন ফিরে পেলে, বিজয়াদিত্য পশ্চিম চালুক্য রাজ্যে আশ্রয় লাভ করেন। সোমেশ্বর তখন বিজয়াদিত্যর হয়ে বেঙ্গি আক্রমণ করেন। রাজেন্দ্র চোল তখন অতি বৃদ্ধ। রাজাধিরাজ দক্ষিণ ভারতে ব্যস্ত। এই অবস্থায় রাজরাজের সাহায্যের জন্য একজন ব্রাহ্মণ সেনাপতিকে পাঠানো হয়। কলিদিন্দ নামক স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। ১০৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যু হলে, প্রথম রাজাধিরাজ চোল সিংহাসন লাভ করেন।

রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাধিকারিগণ ১০৪৪-১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজেন্দ্র চোলের তিন পুত্র একের পর এক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁরা পিতার কাছ থেকে যে বিস্তৃত সাম্রাজ্য লাভ করেন, মোটামুটি-ভাবে তার আয়তন এবং মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের প্রায়ই তুঙ্গভদ্রা-পরবর্তী চালুক্যদের সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়েছিল। প্রথম রাজাধিরাজ তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন। বিপদ দক্ষিণ দিক থেকেও কম ছিল না। পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য সর্বদা সিংহলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে, চোলদের দুর্দৈবের সুযোগ গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। এই পর্বের শেষ দিকে উপরোক্ত বিপদের সঙ্গে পারিবারিক এবং সম্ভবত ধর্মীয় সংকট যুক্ত হয়ে, চোল রাজ্যে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এই বিপ্লবের ফলে চোল সাম্রাজ্য যে মুক্তি অর্জন করেছিল, তার সুফল এক শতাব্দীরও বেশি কাল স্থায়ী

Scanned with CamScanner

হয়েছিল। এই বিপ্লবের দ্বারা, এক সংকটকালে চোলদের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পূর্ব-চালুক্যদের ঐশ্বর্য যুক্ত হয়েছিল, চোলদের সিংহাসনে চোল রাজার পরিবর্তে চালুক্য-চোল রাজেন্দ্র এসেছিলেন। এইভাবে অনিঃশেষ সংঘর্ষে চোল রাজবংশ যখন বিপন্ন, তখন একটি নতুন, অধিকতর প্রাণবন্ত অথচ চোলদের সঙ্গে নিকট-সম্পর্কিত নতুন রাজবংশের আবির্ভাবের ফলে চোল সাম্রাজ্যের সক্রিয় ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকতে পেরেছিল। এই পটভূমিতে এখন রাজেন্দ্র চোলের বংশধরদের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়।

রাজেন্দ্র চোলের পর রাজাধিরাজ ১০৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বের বেশির ভাগ সময় তিনি সিংহলের শান্তি বিধানের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সিংহলে রাজাধিরাজ এবং রাজেন্দ্রের মুদ্রা এবং এই পর্বের বিভিন্ন লেখ পাওয়া গেছে। এইগুলি থেকে মনে হয় যে, সিংহলের অধিকাংশ চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি বিভাগ বলে গণ্য হত, কিন্তু এই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ সিংহলের স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। ১০৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে এই সংগ্রামের নায়ক ছিলেন বিজয়বাহু। সিংহলের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গত প্রয়াস ব্যর্থ করার জন্য চোল শাসকগণ অনেক সময় বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

১০৪৪-৪৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজাধিরাজ পশ্চিম চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি শত্রু সেনাবাহিনীকে কৃষ্ণা তীরবর্তী ধান্যকটকের যুদ্ধে পরাজিত করেন। তারপর তিনি পশ্চিম চালুক্য রাজ্যে প্রবেশ করে কুলপকের দুর্গে অগ্নিসংযোগ করেন। এর পরে কৃষ্ণা তীরে পুণ্ডুরের যুদ্ধে তিনি পুনরায় জয়লাভ করেন। কৃষ্ণা নদী অতিক্রম করে তিনি ইয়াদগিরে একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। চালুক্য রাজধানী কল্যাণী অগ্নিদগ্ধ করা হয়। শত্রু পুরীতে তাঁর বীরাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়, এবং তিনি বিজয়রাজেন্দ্র অভিধা গ্রহণ করেন। সোমেশ্বরের লেখগুলিতে রাজাধিরাজের এই অভিযানের অথবা পরবর্তী কোপপম যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। তাই চোলদের বাগাড়ম্বর সত্ত্বেও, চালুক্য শক্তি অটুট ছিল বলে মনে হয়। সোমেশ্বরের লেখ থেকে মনে হয় যে, তুঙ্গভদ্রার দিকে চালুক্য সাম্রাজ্য অক্ষুন্ন ছিল। চালুক্য এলাকায় বারংবার চোল আক্রমণের ফলে ভৌগোলিক দিক থেকে তাঁদের কোন ক্ষতি হয় নি। চোলগণ চালুক্যদের উপর রাজনৈতিক অধীনতা আরোপ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। ১০৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে সোমেশ্বর চোল বাহিনীকে তাঁর রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। বেঙ্গির উপর তাঁর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর তিনি রাজরাজের আনুগত্য লাভ করেন। সব শেষে তিনি চোল রাজ্যে সেনাবাহিনী পাঠান। এই অবস্থায়ও রাজাধিরাজ বেঙ্গি অথবা কলিঙ্গ পুনরুদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নি। তবে তিনি যুবরাজ

দ্বিতীয় রাজেন্দ্রর সহযোগিতায় পুনরায় সোমেশ্বরকে আক্রমণ করেন। ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণা তীরবর্তী কোপপমে (কোপবল) রাজাধিরাজ মারাত্মক ভাবে আহত হলে, দ্বিতীয় রাজেন্দ্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ এবং জয়লাভ করেন। দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান যুদ্ধ ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। কোল্লাপুরে একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করে তিনি রাজধানীতে ফিরে আসেন।

যুবরাজ নিযুক্ত হওয়ার সময় থেকে কোপপমের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করা পর্যন্ত রাজাধিরাজ অবিরাম যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন আজন্ম যোদ্ধা। তাঁর যুদ্ধ প্রতিভা অতি বিস্তৃত চোল সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্যয়িত হয়েছিল। যে রাজ্যগুলি চোলদের অধীনতা কোন মতেই মেনে নিতে চায়নি, তাদের দমন করে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সহজ সাধ্য ছিল না।

দ্বিতীয় রাজেন্দ্র ১০৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে সোমেশ্বর কোপপমের যুদ্ধের গ্লানি মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা করতে পারেন নি। ১০৬১ খৃষ্টাব্দে রাজরাজের মৃত্যু হলে সোমেশ্বর সপ্তম বিজয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় শক্তিবর্মণকে বেঙ্গির সিংহাসনে বসান এবং তাঁকে সাহায্যের জন্য চামুণ্ডরাজের নেতৃত্বে সেখানে সৈন্যদল পাঠান। তিনি তাঁর দুই পুত্রের অধীনে অপর এক সেনাবাহিনী গঙ্গাবাদি আক্রমণের জন্য পাঠান। দ্বিতীয় রাজেন্দ্র যুগপৎ এই দুইটি আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিলেন। বেঙ্গিতে চামুণ্ডরাজ এবং দ্বিতীয় শক্তিবর্মণ উভয়েই নিহত হন। মহীশূরের অন্তর্গত কুড়লির যুদ্ধে তিনি গঙ্গবাদি আক্রমণ ব্যর্থ করেন। দ্বিতীয় রাজেন্দ্র পশ্চিম চালুক্যগণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। তবে আর একদিক থেকে তাঁর রাজত্বকাল স্মরণীয়। তিনি তাঁর কন্যাকে পূর্ব চালুক্য যুবরাজ দ্বিতীয় রাজেন্দ্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। এই দ্বিতীয় রাজেন্দ্রই পরবর্তী কালের চোল-চালুক্য রাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ।

দ্বিতীয় রাজেন্দ্রর পর বীররাজেন্দ্র রাজা হন। তিনি ১০৭০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পশ্চিম চালুক্যগণের সঙ্গে সংগ্রাম তাঁর রাজত্বকালের মূল বিষয়। এই সংঘর্ষের প্রথম দিকে চালুক্যবাহিনী বেঙ্গিতে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হলেও, চোলগণ কোন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে পারে নি। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা তীরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে প্রথম সোমেশ্বরের সেনাবাহিনী বিশেষ ভাবে পরাজিত হয়। কিন্তু প্রথম সোমেশ্বর এই পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মানেন নি। তিনি তাঁর সামরিক বাহিনী পুনর্গঠিত করে বীররাজেন্দ্রকে কুড়লে দ্বিতীয়বার যুদ্ধে আহ্বান করেন। বীররাজেন্দ্র এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে একমাস কাল কুড়লে অপেক্ষা করেন। কিন্তু প্রথম সোমেশ্বর, হয়ত অসুস্থতার জন্য, যুদ্ধক্ষেত্রে আসেন নি। বীররাজেন্দ্র

Scanned with CamScanner

তখন চালুক্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এর পরে তিনি বেজোয়াদার যুদ্ধে চালুক্যদের আর একবার পরাজিত করেন। বীররাজেন্দ্র অতঃপর কৃষ্ণা নদী অতিক্রম করে কলিঙ্গে পৌঁছান এবং এখানে অনেক যুদ্ধ করেন। যুবরাজ রাজেন্দ্র, ভবিষ্যৎ প্রথম কুলোত্তুঙ্গ, কলিঙ্গে চোলদের পক্ষ অবলম্বন করেন। ১০৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম সোমেশ্বরের মৃত্যু হলে, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, দ্বিতীয় সোমেশ্বর পশ্চিম চালুক্যগণের রাজা হন। বীররাজেন্দ্র তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন। চোল বাহিনী গুট্টি অবরোধ এবং কর্মপিলি আক্রমণ করে। দ্বিতীয় সোমেশ্বরের ছোট ভাই বিক্রমাদিত্য তখন দ্বিতীয় সোমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে চোলদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করেন। এর ফলে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যায়। পশ্চিম চালুক্য রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়। বিক্রমাদিত্য বীররাজেন্দ্রর অধীন সামন্ত নৃপতি রূপে বেঙ্গি শাসন করতে রাজি হন। বীররাজেন্দ্র বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দেন। বিক্রমাদিত্য, ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য রূপে পশ্চিম চালুক্য রাজ্যের দক্ষিণাংশ শাসন করেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে চিরকালীন চোল-চালুক্য বিরোধের এই ভাবে অবসান হয়েছিল। কিন্তু ১০৭০ খৃষ্টাব্দে বীররাজেন্দ্রর মৃত্যুর পরে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল।

বীররাজেন্দ্র শুধু যে পশ্চিম চালুক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, এমন নয়। ১০৬৭ খৃষ্টাব্দের অল্পকাল পূর্বে তিনি সিংহল আক্রমণ করেন। সিংহলের রাজা প্রথম বিজয়বাহু সিংহল থেকে চোল শাসনের অবসান ঘটাতে চাইলে, এই অভিযানের প্রয়োজন হয়। যুদ্ধে বিজয়বাহু পরাজিত হন। বীররাজেন্দ্রর লেখতে দাবি করা হয়েছে যে বীররাজেন্দ্র সমগ্র সিংহলের উপর তাঁর অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু এই দাবি সর্বাংশে সত্য মনে হয় না। কেননা বিজয়বাহু অল্পকাল পরে চোলদের সঙ্গে সংগ্রাম পুনরায় শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ সিংহল, অর্থাৎ রোহনের উপর অধিকার হারালে তিনি এ কাজ করতে পারতেন না। বীররাজেন্দ্রর রাজত্বকালের সপ্তম বৎসরের লেখ্য থেকে জানা যায় যে, একজন রাজা, যিনি তাঁর সাহায্যে প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, তাঁর হয়ে তিনি শ্রীবিজয় জয় করেন। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ জানা যায় না।

১০৭০ খৃষ্টাব্দে বীররাজেন্দ্রর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র মাত্র কয়েক সপ্তাহ রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকাল এত সংক্ষিপ্ত হয়েছিল কেন এবং কীভাবে দ্বিতীয় রাজেন্দ্র, অর্থাৎ কুলোত্তুঙ্গ চোল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন, তা নিশ্চিত জানা যায় না। অনেকের মতে বীররাজেন্দ্র কুলোত্তুঙ্গকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কিন্তু অধিরাজেন্দ্রর লেখ, অথবা বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে এর সমর্থন

পাওয়া যায় না। বীররাজেন্দ্রের মৃত্যুর পরে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের জন্য রাজ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। কুলোত্তুঙ্গ এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিনা, জানা যায় না, তবে তিনি হয়ত এই গোলযোগের সুযোগ নিয়েছিলেন। বৈষ্ণবদের প্রতি চোল রাজাদের অত্যাচার হয়ত এই বিদ্রোহে ইন্ধন যুগিয়েছিল। সে যাই হক, ১০৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কুলোত্তুঙ্গ চোল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গ ১০৭০-১১২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে চোল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল। বিগত এক শতাব্দীব্যাপী বেঙ্গি সন্দেহজনক ভাবে চোল সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেছিল। কিন্তু তাঁর সময় বেঙ্গি নিশ্চিতভাবে এই সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রথম কুলোত্তুঙ্গের পুত্রগণ বেঙ্গি শাসন করেছিলেন। এর ফলে বেঙ্গিতে পশ্চিম চালুক্যগণের ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা দূর হয়েছিল এবং চোল সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব সাফল্য ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। তিনি অকারণ যুদ্ধ না করে জনসাধারণের কল্যাণের দিকে মন দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের স্থায়ী ফল, তাঁর পরবর্তী শাসকদের রাজত্বকালে দেখা গিয়েছিল। তাঁর পরে প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপী, তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকালের সূচনা পর্যন্ত, চোল সাম্রাজ্য আগের মত বিস্তৃত না হলেও, সুসংহত ছিল। পূর্বের অবিরাম যুদ্ধ এই শতাব্দীকে লাঞ্ছিত করেনি। তুঙ্গভদ্রা অতিক্রম করে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের অসম্ভব প্রয়াস তিনি বর্জন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে মহীশূরে হোয়সলাদের উত্থানের ফলে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন ঈষৎ সংকুচিত হয়েছিল। সাময়িকভাবে বেঙ্গির উপর অধিকারও তিনি হারিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর পরবর্তী শাসকগণ এই অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তাঁর সংগতি অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে সংযত করেছিলেন। তিনি অসম্ভবের সাধনায় মত্ত হন নি। তিনি তাঁর প্রজাদের এক শতাব্দীর শান্তি এবং সুশাসন দান করেছিলেন।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গ যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন তাঁর ভবিষ্যৎ অন্ধকার মনে হয়েছিল। যুদ্ধ এবং বিদ্রোহ, দুই-ই তাঁকে বিপন্ন করেছিল। সিংহলসহ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ অংশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। প্রথম কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের প্রথম কয়েকটি বৎসর এইসব সমস্যা সমাধানে ব্যয়িত হয়েছিল।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গকে সর্বপ্রথম পশ্চিম চালুক্য রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। বিক্রমাদিত্য দেখেছিলেন যে, বেঙ্গির উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। বরং বেঙ্গির সঙ্গে চোলদের সংযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই তিনি কুলোত্তুঙ্গের সিংহাসন

Scanned with CamScanner

আরোহণে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন। কুলোত্তুঙ্গ এই সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের বড় ভাই দ্বিতীয় সোমেশ্বরের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে, নিজের শক্তি বাড়িয়েছিলেন। বিক্রমাদিত্য অনেক মিত্র এবং অধীন সামন্ত নরপতির সাহায্য লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে দেবগিরির যাদব রাজা ছিলেন প্রধান। উভয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ সম্পর্কে বিহ্লন এবং চোল লেখতে ভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক দিক থেকে চোল লেখ বেশি নির্ভরযোগ্য। কুলোত্তুঙ্গের রাজ্যারোহণের পাঁচ কি ছয় বৎসর পরে এই যুদ্ধ ঘটেছিল। মধ্যবর্তী সময় উভয় পক্ষই সামরিক এবং কূটনৈতিক দিক থেকে শক্তি সঞ্চয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যর চোল রাজ্য আক্রমণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বিক্রমাদিত্য কোলার জেলায় চোলবাহিনীর সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই যুদ্ধে চোল রাজা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ভিন্ন গঙ্গামণ্ডলম এবং সিংগনম লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় স্থানটি কোথায়, সঠিক জানা যায় না। কুলোত্তুঙ্গ দাবি করেছেন যে, এই যুদ্ধের ফলে তিনি মহীশূরের অংশবিশেষ লাভ করেন। তাঁর লেখ দ্বারা এই দাবি সমর্থিত হয়।

বিহ্লন লিখেছেন যে, বনবাসির সদ্য নিযুক্ত শাসক জয়সিংহ তাঁর ভাই বিক্রমাদিত্যর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের পরিকল্পনায় কুলোত্তুঙ্গের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু চোল রাজা এই ভ্রাতৃবিরোধে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। কেননা, তাঁকে অন্যত্র মন দিতে হয়েছিল। বিক্রমাদিত্য সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করে, কুলোত্তুঙ্গের শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছিলেন। বিজয়বাহু সিংহলে স্বাধীনতা ঘোষণার পর, তিনি তাঁর কাছে উপঢৌকন সহ দূত পাঠিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিক্রমাদিত্য তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে কুলোত্তুঙ্গকে বিপন্ন করার সব চেষ্টাই করেছিলেন।

কুলোত্তুঙ্গ যখন দক্ষিণ দিকে ব্যস্ত, তখন ত্রিপুরীর হৈহয় রাজ বেঙ্গি আক্রমণ করেন। তবে সামরিক অথবা রাজনৈতিক দিক থেকে এই আক্রমণ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। অনেকে এই আক্রমণের সঙ্গে পশ্চিম চালুক্যগণের যোগসাজসের কথা বলেছেন। কিন্তু তাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়নি।

বিক্রমাদিত্যর সঙ্গে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও কুলোত্তুঙ্গকে দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হয়। সেখানে পাণ্ড্য রাজা চোল অধীনতা কখনও মেনে নেয় নি। বীররাজেন্দ্রর মৃত্যুর পরে যে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছিল, অধিরাজেন্দ্রর সময় যে বিদ্রোহ ঘটেছিল এবং বিক্রমাদিত্যর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হওয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, দক্ষিণের রাজ্যগুলি তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য, তার সদ্ব্যবহার করেছিল। চোল রাজারা এই অঞ্চলে যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন তার কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। আঞ্চলিক লেখগুলি

থেকে জানা যায় যে, স্থানীয় শাসকগণ স্বাধীন অধিকারে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করছিলেন। কুলোত্তুঙ্গ প্রভূত চেষ্টায় তাঁর রাজত্বের সপ্তম এবং অষ্টম বৎসরে পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্যের উপর চোল অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সিংহল স্থায়ী ভাবে চোল সাম্রাজ্যের বাইরে চলে যায়। দক্ষিণ সিংহল ইতিপূর্বেই স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। ১০৭০ খৃস্টাব্দের পরে উত্তর সিংহলে আর কোন চোল লেখ পাওয়া যায় নি। মহাবংশে উত্তর সিংহলের স্বাধীনতা লাভের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম কুলোত্তুঙ্গের প্রথম পাঁচ বৎসরের ইতিহাস এই বিবরণকে সমর্থন করে। কুলোত্তুঙ্গের কোন লেখ সিংহলে পাওয়া যায় নি, এই ঘটনাও একই ইঙ্গিত বহন করে। সিংহলের স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়ক ছিলেন বিজয়বাহু।

সিংহলের স্বাধীনতা চোল সাম্রাজ্যের পক্ষে ততটা ক্ষতিকর ছিল না। সে তুলনায় ভারতের মূল ভূভাগে পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্যের বিদ্রোহ জয়যুক্ত হলে, ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল অনেক বেশি। কুলোত্তুঙ্গ জানতেন যে, তাহলে সমগ্র সাম্রাজ্যই ভেঙ্গে পড়বে। তাই চালুক্য যুদ্ধের অবসান মাত্র তিনি এই বিদ্রোহ দমনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। চিদাম্বরমে প্রাপ্ত একটি সংস্কৃত লেখতে আছে যে, কুলোত্তুঙ্গ পাঁচজন পাণ্ড্য রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। কেরলকে তিনি দুইবার নৌ-যুদ্ধে পরাজিত করেন। পাঁচজন পাণ্ড্য রাজার প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না। ইতিপূর্বে প্রথম রাজরাজ পাণ্ড্যরাজ্যে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, কুলোত্তুঙ্গের পক্ষে তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। তিনি পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সামরিক উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তিনি এই রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করেন নি। তিনি সেখান থেকে বার্ষিক কর আদায় করে সন্তুষ্ট ছিলেন। এই উপনিবেশগুলি অবশ্য তাঁর অধিকারের প্রতীক রূপে বিবেচিত হত। এই যুগের পাণ্ড্য রাজাদের অসংখ্য লেখতে তাঁদের চোল-অধীনতার চিহ্ন বিশেষ পাওয়া যায় না। চোলদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে কুলোত্তুঙ্গ এবং তাঁর পরবর্তী শাসকদের লেখ যত বেশি সংখ্যায় পাওয়া গেছে, এই অঞ্চলে তা পাওয়া যায় নি।

বিজয়বাহু কর্তৃক সিংহলের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা প্রথম কুলোত্তুঙ্গের মনে কাঁটার মত বিঁধেছিল। তাই তিনি বিজয়বাহুর সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। সিংহলের জনসমষ্টির উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল তামিল। সিংহলের সেনাবাহিনীতেও তামিলদের সংখ্যা খুব কম ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই তামিলদের মনে চোলদের সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। কুলোত্তুঙ্গ এই দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কুটিল নীতি সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। কুলোত্তুঙ্গের অনুকূলে অনুষ্ঠিত বিদ্রোহ

Scanned with CamScanner

দমনের পরে তামিল সেনাবাহিনী বিজয়বাহুর প্রতি তাদের আনুগত্য পুনরায় প্রকাশ করেছিল। আপাত দৃষ্টিতে দুই রাজার মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, কেননা কুলোত্তুঙ্গ তাঁর কন্যাকে জনৈক সিংহলী রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গ চীন এবং শ্রীবিজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। চীনের সং বংশের ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে, চোল-রাজা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে চীনে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন। এর ফলে চোলদের বাণিজ্য স্বার্থ বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১০৯০ খৃষ্টাব্দে শ্রীবিজয়ের রাজা প্রথম কুলোত্তুঙ্গের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি যেন নেগপত্তমে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত দুই বিহারের জন্য প্রদত্ত গ্রামগুলির উল্লেখ করে একটি তাম্রপট্ট প্রচার করেন। সুতরাং এই যুগে মলয় উপদ্বীপ অঞ্চলে চোলদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের কোন প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, একথা বলা যায় যে ইতিপূর্বে উভয়ের মধ্যে যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, প্রথম কুলোত্তুঙ্গ এবং সম্ভবত তাঁর পরবর্তী রাজাদের আমলে তা সযত্নে রক্ষা করা হয়েছিল।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গের রাজ্যলাভের পূর্ব থেকে সপ্তম বিজয়াদিত্য বেঙ্গি শাসন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে কুলোত্তুঙ্গের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। বিজয়াদিত্যর মৃত্যুর পরে, ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে কুলোত্তুঙ্গ তাঁর অন্যতম পুত্র রাজরাজ চোড়কে বেঙ্গির শাসক পদে নিযুক্ত করেন। অল্পকাল পরে তিনি পদত্যাগ করলে, তাঁর ছোট ভাই বীর চোড় ঐ পদে নিযুক্ত হন। তিনি ছয় বৎসর (১০৭৮-১০৮৪ খৃষ্টাব্দ) বেঙ্গি শাসন করেন। ১০৮৪-১০৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুলোত্তুঙ্গের অন্য এক পুত্র, রাজরাজ চোড়গঙ্গ বেঙ্গি শাসন করেন। ১০৮৯ খৃষ্টাব্দে কুলোত্তুঙ্গ তাঁকে পাঁচ বৎসরের জন্য বেঙ্গি থেকে ফিরিয়ে আনেন। অনুমান করা হয় যে, তাঁর কাজে কুলোত্তুঙ্গ সন্তুষ্ট ছিলেন না। চোড়গঙ্গ জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও যে পূর্বে বেঙ্গির শাসক পদে নিযুক্ত হন নি এই তথ্য এই অনুমানকে দৃঢ়তর করে। ১০৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে বীর চোড় দ্বিতীয়বার এই পদে নিযুক্ত হন এবং ১০৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন। তাঁর পরে বিক্রমচোল এই পদে নিযুক্ত হন এবং ১১১৮ খৃষ্টাব্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই পদে থাকেন। একের পর এক রাজপুত্রদের প্রাদেশিক শাসক পদে নিয়োগ ছিল চোল শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গ দুইবার কলিঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের ছাব্বিশতম বৎসরের লেখতে প্রথম কলিঙ্গ যুদ্ধের উল্লেখ আছে। বিক্রম চোল এই যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের বিয়াল্লিশতম বৎসরের লেখতে দ্বিতীয় কলিঙ্গ যুদ্ধের কথা আছে। বিক্রমচোলের এই যুদ্ধে

কোন ভূমিকা ছিল না।

বেঙ্গির বিরুদ্ধে কলিঙ্গের আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে হয়ত প্রথম কলিঙ্গ যুদ্ধ ঘটেছিল। এর ফলে গোদাবরী থেকে মহেন্দ্র পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত কলিঙ্গের দক্ষিণ অংশ চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এল্লোরের নৃপতি কলিঙ্গের পক্ষে ছিলেন। পাণ্ড্য রাজা, পরান্তক বিক্রমচোলকে সাহায্য করেন। এই যুদ্ধের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয় স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের জন্য এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন রাজ্য জয় এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল না। দক্ষিণ কলিঙ্গ বলতে যে অঞ্চল বোঝায়, তা বিক্রমচোলের পূর্ব থেকেই বেঙ্গি প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এই আঞ্চলিক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল এবং সমগ্র এলাকার উপর চোল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১০৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের কুলোত্তুঙ্গের সিংহাচলম লেখতে এই তথ্য পাওয়া যায়।

১১১০ খৃষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় কলিঙ্গ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কুলোত্তুঙ্গের লেখতে এর অপেক্ষাকৃত বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন করুণাকর। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ অস্পষ্ট। সাহিত্য উপাদানে বলা হয়েছে যে উত্তর কলিঙ্গের রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ পর পর দুই বৎসর বার্ষিক কর না দেওয়ায় চোল রাজা উত্তর কলিঙ্গ আক্রমণের আদেশ দেন। এই বর্ণনা কতটা ঐতিহাসিক, তা বলা যায় না। অনন্তবর্মণ তাঁর সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ রাজত্বকালে অধীন রাজা হিসাবে বরাবর কুলোত্তুঙ্গকে বার্ষিক কর দিয়ে এসেছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এই যুদ্ধে চোল বাহিনী উত্তর কলিঙ্গে ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসকার্য চালিয়েছিল। অনন্তবর্মণ প্রথম দিকে এই আক্রমণ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। পরে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে, তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। করুণাকরের নেতৃত্বে এই অভিযান কোন স্থায়ী ফল প্রসব করেনি। উত্তর কলিঙ্গে চোল অধিকারের কোন প্রমান পাওয়া যায়নি।

কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের পঁয়তাল্লিশতম বৎসরে তাঁর সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ সীমা স্পর্শ করেছিল। একমাত্র সিংহল ভিন্ন সাম্রাজ্যের অপর কোন অংশ তাঁকে হারাতে হয়নি। তুঙ্গভদ্রা নদী মোটামুটিভাবে চোল এবং পশ্চিম চালুক্য রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত রচনা করেছিল। নন্দলুর (কুড্ডাপা), ত্রিপুরান্তকম (করনুল) এবং মহীশূরে প্রাপ্ত লেখ থেকে বোঝা যায় যে, পঁয়তাল্লিশতম বৎসরেও এই অংশগুলি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেঙ্গির উপরও তাঁর অধিকার বিশেষ ভাবে বলবৎ ছিল এবং এই জন্য তাঁর পক্ষে কলিঙ্গ আক্রমণ করা সম্ভব হয়েছিল।

কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকালের শেষ দিকে উদীয়মান হোয়সলাগণ, তাঁর কাছ থেকে মহীশূরের অন্তর্গত গঙ্গবাদি প্রদেশটি ছিনিয়ে নিয়েছিল। এই সময়

Scanned with CamScanner

হোয়সলাগণের রাজা ছিলেন বিষ্ণুবর্ধন (১১০০-১১৫২ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর দণ্ড-নায়ক গঙ্গরাজ তলকাড়ের নিকট কোন স্থানে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে চোলদের পরাজিত করেছিলেন। বিষ্ণুবর্ধনের লেখতে চোলদের বিরুদ্ধে তাঁর সাফল্য সম্পর্কে অত্যুক্তি করা হয়েছে। এই বর্ণনা অনুসারে গঙ্গরাজের অভিযানের ফলে তালকাড়, নীলগিরি, নঙ্গিলি, কোলাল, কোয়াত্তুর এবং কোঙ্গুরের অংশ বিশেষ বিষ্ণুবর্ধনের অধিকারে এসেছিল। অন্য ভাবে জানা যায় যে, তিনি হয়ত রামেশ্বরম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তা যদি হয়, তাহলে বিষ্ণুবর্ধনের পূর্বোক্ত দাবিকে একেবারে ভিত্তিহীন বলা চলে না। সে যাই হক, যেহেতু ১১১৫ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কুলোত্তুঙ্গের কোন লেখ মহীশূরে পাওয়া যায়নি, সেই হেতু বলা যায় যে অন্তত গঙ্গবাদি অঞ্চলটি তিনি হারিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তীকালে বিক্রম চোলের লেখ কোলার অঞ্চলে পাওয়া যাওয়ায় মনে হয় যে এই অঞ্চলে চোল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই সময় পশ্চিম চালুক্যগণের রাজা বিক্রমাদিত্য প্রথম কুলোত্তুঙ্গের কাছ থেকে সমগ্র বেঙ্গি প্রদেশ না হলেও তার উত্তরাংশ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু পর্যন্ত এই অঞ্চল পশ্চিম চালুক্যগণের অধিকারে ছিল। ১১১৮ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম কুলোত্তুঙ্গ বিক্রমচোলকে বেঙ্গি থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন, সম্ভবত তখন এই ঘটনা ঘটেছিল। সুতরাং কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের সূচনায় চোল সাম্রাজ্যের আয়তন যা ছিল, তাঁর অন্তিম লগ্নে তা ছিল না। সিংহল, গঙ্গবাদি এবং বেঙ্গির একাংশ হারিয়ে চোল সাম্রাজ্য একটি তামিল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

তাঁর রাজধানী ছিল গঙ্গাপুরি অথবা গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম। দ্বিতীয় নগরী ছিল কাঞ্চীপুরম। এখানে একটি অভিষেক মণ্ডপ এবং রাজপ্রাসাদ ছিল।

বিক্রম চোল ১১১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর রাজত্ব শুরু করেন, যদিও ১১২২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন। তিনি প্রথম কুলোত্তুঙ্গের কাছ থেকে একটি সঙ্কুচিত সাম্রাজ্য লাভ করেন। তাঁর সতেরো বৎসরের রাজত্বকাল মোটামুটিভাবে শান্তিপূর্ণ ছিল। তিনি উত্তর এবং পশ্চিম দিকে হৃত রাজ্য উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। পশ্চিমের তুলনায় উত্তরেই তাঁর সাফল্য বেশি হয়েছিল।

১১২৬ খৃষ্টাব্দে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হলে, তাঁর পুত্র, শান্তস্বভাব তৃতীয় সোমেশ্বর চালুক্যগণের রাজা হলে, বিক্রম চোল, সমগ্র বেঙ্গিতে না হলেও তার দক্ষিণ অংশে চোল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই কাজ একবারে সম্পন্ন হয়নি। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে বিক্রমচোল এই কাজ আরম্ভ করেন এবং ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে গোদাবরী তীরে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই অঞ্চলের তেলেগু নরপতিগণ পশ্চিম চালুক্যদের শাসনের চেয়ে চোলদের শাসন বেশি পছন্দ করতেন। তাঁদের এই মনোভাব বিক্রমচোলকে সাহায্য করেছিল। বিক্রম চোলের গঙ্গবাদি পুনরুদ্ধারের প্রয়াস সাধারণভাবে সফল হয় নি। তবে তাঁর রাজত্বের দশম বৎসরের একটি লেখ কোলার জেলায় পাওয়া গেছে। তা থেকে মনে হয় যে, তিনি পূর্ব মহীশূর ফিরে পেয়েছিলেন।

তাঁর রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে, প্রবল বন্যায় তাঁর সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষ বিশেষ বিপন্ন হয়েছিল। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চিদাম্বরমের শিব মন্দিরের উন্নতি কল্পে সেই বৎসরের সমগ্র রাজস্ব ব্যয় করেছিলেন। রাজধানীর নিকটবর্তী হওয়ায় তখন এই নগরের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিক্রম চোল বারবার সাম্রাজ্য প্রদক্ষিণ করেছিলেন। মধ্য যুগের স্বৈরতন্ত্রী শাসকের পক্ষে এই পরিক্রমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। চোল শাসকগণ সেই প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন।

বিক্রম চোলের পুত্র দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গ ১১৩৩ খৃষ্টাব্দে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। এর পরেও প্রায় দুই বৎসর বিক্রমচোল বেঁচে ছিলেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকাল শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল। ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রাজরাজকে যুবরাজ নিযুক্ত করেছিলেন। চিদাম্বরমের শিব মন্দিরের উন্নতি তাঁর সময় শেষ হয়েছিল। এই মন্দির থেকে বিষ্ণু মূর্তি অপসারণ করে তিনি তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করেন। রামানুজ সেটি উদ্ধার করে তিরুপতি মন্দিরে স্থাপন করেন। তিনি সপ্ততল গোপুরম নির্মাণ দ্বারা চিদাম্বরমের মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশ তিনি সোনায় মুড়ে দেন। তাঁর রাজত্বকালে কোন যুদ্ধের কথা জানা যায় না। মনে হয় তাঁর সময় বেঙ্গিতে চোল শাসন স্থিতি লাভ করেছিল। তেলেগু অঞ্চলে প্রাপ্ত তাঁর বহু সংখ্যক লেখ তার প্রমাণ। তামিল সাহিত্যের সার্থক সৃষ্টি, তাঁর রাজত্বের শান্তি ও সমৃদ্ধি সম্ভব করেছিল। তাঁর রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম হলেও, চিদাম্বরমের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

দ্বিতীয় রাজরাজের রাজত্বকালের অনেকগুলি লেখ পাওয়া গেছে। এই লেখগুলির অন্তর্গত প্রশস্তিতে সাম্রাজ্যের আয়তন এবং অধীন সামন্তবর্গের কথা আছে, কিন্তু কোন যুদ্ধ বিগ্রহের কথা নেই। তাই মনে হয় যে, তাঁর রাজত্বকালও শান্তিতে অতিবাহিত হয়েছিল। বেঙ্গির প্রায় সর্বত্র তাঁর বহু-সংখ্যক লেখ পাওয়া গেছে। এগুলির দ্বারা একদিকে যেমন বেঙ্গির উপর তাঁর অধিকার প্রতিপন্ন হয়, তেমন সেখানকার সামন্তবর্গের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের শেষ দিক থেকে যেমন সাম্রাজ্যের সংকোচন শুরু হয়েছিল, তেমন অন্যদিকে স্থানীয় শাসকদের

Scanned with CamScanner

ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। সাম্রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব কোনদিনই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় রাজরাজের রাজত্বের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসনেও দুর্বলতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট হয়েছিল। ইতিপূর্বে চোল সম্রাটগণ যে প্রবল প্রতাপ নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন এবং যে রাজতন্ত্রে সম্রাটগণ যুদ্ধ জয়ের গৌরব অর্জনে এবং জনকল্যাণে সদা নিযুক্ত ছিলেন, এই যুগে তা আর বলবৎ ছিল না। তৎকালীন লেখগুলিতে অধীন নরপতিদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও অধিকারের সামনে চোল রাজাদের অসহায় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের স্বায়ত্তশাসন তখনও অব্যাহত ছিল, কিন্তু প্রথম রাজরাজ এবং তাঁর উত্তরসূরিগণ যে কেন্দ্রাভিমুখী আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন, তা অনেকাংশে দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

১১৭৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় রাজরাজের রাজত্ব শেষ হয়েছিল। তাঁর পরবর্তী চোল রাজা দ্বিতীয় রাজাধিরাজের লেখ থেকে জানা যায় যে ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজত্ব শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় রাজাধিরাজ রাজরাজের পুত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিক্রম চোলের পৌত্র। তাঁর বংশধরদের মধ্যে যোগ্য ব্যক্তি না থাকায়, রাজরাজ রাজাধিরাজকে মনোনীত করেছিলেন। এই মনোনয়নের অল্পকাল মধ্যে পাণ্ড্য রাজ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল এবং ভারতের মূল ভূভাগে সিংহলের প্রভাব প্রতিহত করার জন্য চোলদের এই গৃহযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় রাজরাজের মৃত্যুর আগেই এই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা যেহেতু দ্বিতীয় রাজাধিরাজ এবং তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের লেখ্যতে পাওয়া যায়, সেই হেতু তাঁদের রাজত্বকাল প্রসঙ্গে এই বিষয়টি আলোচ্য।

দ্বিতীয় রাজাধিরাজ এবং তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ ১১৬৩-১২১৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় রাজাধিরাজের সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরে পাণ্ড্য রাজ্যের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধে সিংহলরাজ এবং চোলরাজ দুই বিরোধী পক্ষে যোগ দেন। এর ফল কোন রাজ্যের পক্ষই শুভ হয়নি। পাণ্ড্যগণ গৃহযুদ্ধের আগুনে শুচিশুদ্ধ হয়ে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পায় এবং শেষ পর্যন্ত চোল ও সিংহল রাজ্য, দুই-ই গ্রাস করে। দ্বিতীয় রাজাধিরাজের একাধিক লেখতে এবং মহাবংশে, এই ঘটনাবলীর বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথম কুলোত্তুঙ্গের পাণ্ড্য রাজ্য জয় করার পর থেকে স্থানীয় রাজবংশের ব্যক্তিগণ তাদের ইচ্ছামত এই রাজ্য শাসন করতেন। চোলদের প্রতি তাঁদের নামমাত্র আনুগত্য ছিল। প্রথম কুলোত্তুঙ্গের পরে চোল রাজাদের লেখ পাণ্ড্য রাজ্যে বিশেষ পাওয়া যায়নি। ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে মাদুরার পরাক্রম পাণ্ড্য এবং কুলশেখরের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। পরাক্রম সিংহলরাজ

পরাক্রমবাহুর কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। এই সাহায্য পৌঁছানোর পূর্বেই কুলশেখর মাদুরা অধিকার এবং পরাক্রমকে হত্যা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সিংহল সেনপতি লঙ্কাপুর পরাক্রমের বংশধরকে পাণ্ড্য রাজ্যের সিংহাসনে স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং সিংহল রাজের নির্দেশে, এই যুদ্ধ চালিয়ে যান। কুলশেখর তখন চোল রাজার সাহায্য প্রার্থনা করলে, সেনাপতি পল্লব রায়ের নেতৃত্বে চোলবাহিনী পাঠানো হয়। এইভাবে সিংহল এবং চোলরাজ্যের মধ্যে প্রাচীন সংগ্রাম নতুন ভাবে শুরু হয়। যুদ্ধে প্রথম দিকে কুলশেখর পরাজিত হন এবং সিংহল সেনাপতি, পরান্তকের পুত্র বীর পাণ্ড্যকে সিংহাসনে বসান। কিন্তু শীঘ্রই যুদ্ধের ধারা পরিবর্তিত হয়। পল্লব রায়ের নিকট সিংহলের সৈন্যদল পরাজিত হয়। লঙ্কাপুর নিহত হন। কুলশেখর পুনরায় মাদুরায় প্রবেশ করেন। এইভাবে পাণ্ড্য রাজ্যকে সিংহলের একটি প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিক্রমবাহু ভারতীয় ভূখণ্ডে পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন জেনে, পল্লব রায় সিংহল সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার বিক্রমবাহুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবল্লভের পক্ষ অবলম্বন করেন। শ্রীবল্লভের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল সিংহলের কয়েকটি স্থান অধিকার ও ধ্বংস করে। বিক্রমবাহু উপলব্ধি করেন যে, পরাক্রম পাণ্ড্যের বংশের দাবিকে সমর্থন করে তিনি শুধু ধ্বংস ডেকে এনেছেন। তাই তিনি কুলশেখরকে বৈধ রাজা হিসাবে মেনে নেন এবং তাঁর সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। কুলশেখরের এই বিশ্বাসঘাতকতায় চোলদের কূটনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পল্লব রায় বীরপাণ্ড্যকে মাদুরার সিংহাসনে স্থাপন করে কুলশেখরকে নির্বাসনে পাঠান। পরাক্রমবাহুর দুরভিসন্ধি এইভাবে ব্যর্থ হয়। এই ঘটনাগুলি ১১৬৯-৭৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঘটেছিল।

যে সামন্ত নরপতিদের ক্রম-বর্ধমান স্বাধীনতার প্রকাশ দ্বিতীয় রাজরাজের সময় দেখা গিয়েছিল, রাজাধিরাজের রাজত্বকালে তা আরও প্রকটিত হয়েছিল। সাম্বুভরায়, কাড়বরায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ এবং নোল্লোরের তেলেগু চোড়গণ এখন রাজাকে না জানিয়ে, নিজেরা যুদ্ধ এবং মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। চোল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যে রাজকীয় অভিজাতবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরা এখন বংশানুক্রমিক স্থানীয় নরপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। এর ফলে রাজকীয় মর্যাদা বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকালে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় সাম্রাজ্যের আসন্ন অবসান সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ ছিল না।

তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর রাজত্ব শুরু করেন, যদিও দ্বিতীয় রাজাধিরাজ ১১৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। চোল রাজবংশের প্রধান

Scanned with CamScanner

শাখার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, জানা যায় না।

তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকাল ব্যক্তিগত যোগ্যতার জয়লাভের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি যখন সিংহাসন লাভ করেন, তখন চারদিকে ভাঙনের লক্ষণগুলি তাঁর আকার ধারণ করেছিল। পাণ্ড্য রাজ্য সমস্যার সমাধান তখনও হয়নি। এজন্য আরও অনেক যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ তাঁর রাজত্বের বেশির ভাগ সময় পাণ্ড্য রাজ্যের উপর চোল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে পাণ্ড্য রাজ্যে এমন দক্ষ এবং উচ্চাভিলাষী রাজাদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা শুধুমাত্র স্বাধীনতা লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কুলোত্তুঙ্গ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে সদ্যোজাত পাণ্ড্য সাম্রাজ্যবাদের আঘাত সহ্য করেছিলেন। সামন্ত নরপতিগণ তাঁদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। এই অতি শক্তিশালী নরপতিদের অশুভ প্রয়াস প্রতিহত করার জন্য তাঁকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তাঁর রাজত্বের প্রায়াবসানের পূর্বে তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন। সাহিত্য, শিল্প এবং স্থাপত্যের দিক থেকেও তাঁর রাজত্বকে শেষ স্মরণীয় কাল বলা যায়। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ ছিলেন চোল ইতিহাসের শেষ স্মরণীয় রাজা। তাঁর পরবর্তী দুর্বল রাজার সময় চোল সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একজন সামন্ত নরপতি পাণ্ড্যগণের সহযোগিতায় তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে অপমান করেন এবং শেষ পর্যন্ত হোয়সলা নৃপতি নরসিংহের হস্তক্ষেপের ফলে তিনি নাম মাত্র সার্বভৌমত্ব ফিরে পান।

পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গকে তিনবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু চোলদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রয়াস পুনরায় শুরু করেন। তাঁর প্ররোচনায় বীর পাণ্ড্য তাঁর পক্ষে যোগ দেন। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ তখন পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করে পাণ্ড্য এবং সিংহলী বাহিনীকে পরাজিত করেন। বীর পাণ্ড্য নির্বাসিত হন। ইতিমধ্যে কুলশেখরের মৃত্যু হওয়ায়, সম্ভবত তাঁর নিকট আত্মীয়, বিক্রম পাণ্ড্যকে মাদুরার সিংহাসনে বসানো হয়। পাণ্ড্য রাজ্য থেকে চোলবাহিনী অপসারণের পর বীর পাণ্ড্য পুনরায় সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এর ফলে তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ দ্বিতীয় বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং নেল্লুরের যুদ্ধক্ষেত্রে বীর পাণ্ড্যের প্রয়াস ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এই যুদ্ধ ঘটেছিল। এই যুদ্ধে বীর পাণ্ড্য কেরালাধিপতির সাহায্য লাভ করেন। কিন্তু বীর পাণ্ড্য শেষ পর্যন্ত মাদুরার প্রকাশ্য দরবারে চোল রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। যতটা শাস্তি বীর পাণ্ড্যর প্রাপ্য ছিল, তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ তাঁকে ততটা শাস্তি দেন নি। তিনি তাঁকে হত্যা না করে, বরং তাঁকে ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন। একটি লেখতে

দাবি করা হয়েছে যে, এই সময় তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ সিংহল রাজার মুকুটের উপর তাঁর পা রেখেছিলেন। এই দাবি ভিত্তিহীন মনে হয়।

দ্বিতীয় পাণ্ড্য যুদ্ধের পর তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ কঙ্গু অঞ্চলে হোয়সলা শক্তি প্রতিহত করার জন্য সৈন্যদল পাঠান। তিনি তগদুরের আদিগৈমানগণের উপর চোল অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং জনৈক চের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে করুবুরে তাঁর বিজয়াভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে হোয়সলা নৃপতি দ্বিতীয় বল্লালের সঙ্গে হয়ত তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, কেননা তিনি চোল রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

১২০৫ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য রাজ্যের বিরুদ্ধে তৃতীয় বার অভিযান প্রেরণ করেন। তাঁর রাজত্বের চৌত্রিশতম বৎসরের লেখতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। পাণ্ড্য রাজ্যের সিংহাসনে তখন ছিলেন জটাবর্মণ কুলশেখর। তিনি হয়ত কুলশেখরের পুত্র ছিলেন। পাণ্ড্য রাজ্যের পুনরভ্যুদয়ের ইতিহাসে তাঁকে প্রথম বড় রাজা বলা যায়। উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ, জানা যায় না। চোল রাজার লেখতে বলা হয়েছে যে, তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ করুবুরে বিজয়াভিষেকের পর মাদুরায় বীরাভিষেকের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে, জটাবর্মণের ঔদ্ধত্য তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গকে এই যুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। চোল রাজা এই অভিযানে মাদুরা অগ্নিদগ্ধ এবং সেখানকার দরবারগৃহ ধ্বংস করেছিলেন। তাঁর এই ধ্বংসকার্যের মধ্যে তাঁর ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতা প্রতিফলিত হয়েছিল। যুদ্ধ শেষে কুলোত্তুঙ্গ জটাবর্মণ কুলশেখরকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, এই অভিযানে তিনি নিরঙ্কুশ সাফল্য অর্জন করেন নি। উপরন্তু এই ধ্বংসলীলার মধ্যে পরবর্তীকালে চোল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মারবর্মণ সুন্দরপাণ্ড্যের প্রতিহিংসার যুদ্ধের বীজ বপন করা হয়েছিল।

এই প্রতিহিংসার যুদ্ধ তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গকে গ্রাস করার পূর্বে তিনি উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বের ঊনবিংশতম বৎসরের শ্রীরঙ্গম লেখ থেকে জানা যায় যে, তিনি উত্তরের রাজাদের ধূলিসাৎ করে কাঞ্চী প্রবেশ করেছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পরবর্তী পদুজোট্টা লেখতে বলা হয়েছে যে, তিনি তেলেগুদের পরাজিত করে বেঙ্গি তাঁর অধিকারে আনেন এবং উরগাই নগরে প্রবেশ করেন। চোলগণ ইতিপূর্বে তেলেগু-চোড়দের কাছে কাঞ্চীপুরম হারিয়েছিলেন এবং তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ তাদের কাছ থেকে তা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের বেঙ্গি বিষয়ক এই দাবি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে, কেননা নেল্লোরের উত্তরে এই সময়ের একটিও চোল লেখ পাওয়া যায় নি। উরগাই বলতে হয়ত কাকতীয়দের রাজধানী ওয়ারঙ্গলকে বোঝানো হয়েছে। কাকতীয়দের শ্রেষ্ঠ রাজা গণপতি তখন এই রাজ্য শাসন

Scanned with CamScanner

করতেন। সুতরাং তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ যদি তাঁকে পরাজিত করে রাজধানীতে প্রবেশ করতেন, তাহলে যুদ্ধের বিশদ বিবরণ চোল লেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু তা পাওয়া যায় নি। তাই তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের এই দাবি কতটা সঙ্গত, তা বলা যায় না।

তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বের শেষ দিকে, ১২১৬ খৃষ্টাব্দে জটাবর্মণ কুলশেখরের মৃত্যু হলে, তাঁর ভাই সুন্দর পাণ্ড্য রাজা হন এবং অবিলম্বে চোলদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের যুদ্ধ আরম্ভ করেন। চোলদের লেখতে এই যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং এজন্য আমাদের সম্পূর্ণভাবে পাণ্ড্য উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয়। এই উপাদান থেকে এটা স্পষ্ট যে, তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গকে তাঁর পূর্বতন নিষ্ঠুর পাণ্ড্য নীতির মাশুল খুব চড়া হারে দিতে হয়েছিল। সুন্দর পাণ্ড্য চোল রাজ্যে চিদাম্বরম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এই আক্রমণের সময় তিনিও ব্যাপকভাবে হত্যা ও ধ্বংসলীলায় মেতে ছিলেন। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গ সাময়িকভাবে পলায়ন করলে, শেষ পর্যন্ত সুন্দর পাণ্ড্যকে তাঁর অধিপতি হিসাবে মেনে নেবেন, এই শর্তে সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরাজিত রাজাকে এইভাবে রাজ্য প্রত্যর্পন করা ছিল শাস্ত্রের বিধান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরও একটি কারণ ছিল। হোয়সলা রাজা দ্বিতীয় বল্লালের অন্যতমা পত্নী ছিলেন চোল-মহাদেবী। হয়ত সেই সূত্রে চোল রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সাহায্য প্রার্থনা করলে, তিনি তাঁর হয়ে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন। তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের প্রতি পাণ্ড্য রাজার মহানুভবতার এটিও অন্যতম কারণ।

১২১৮ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যু হয়। গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম তাঁর রাজধানী ছিল। অন্যান্য প্রাচীন নগরের মধ্যে তাঞ্জোর এবং উরাইয়ুরের গৌরবও কম ছিল না। স্থাপত্য শিল্পে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। ত্রিভুবনমের ত্রিভুবন-বীরেশ্বর মন্দির তাঁর শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। মোটামুটি ভাবে তাঞ্জোরের মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হলেও, এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। এই মন্দিরের প্রাচীরগাত্র ভাস্কর্য এবং অন্যান্য অলঙ্করণে ভরে তোলা হয়েছিল। এই মন্দিরের অভ্যন্তরের উৎকৃষ্ট রামায়ণ রিলিফও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি মুখ-মণ্ডপ, সভা-মণ্ডপ এবং কয়েকটি গোপুরম নির্মাণ করেন।

তাঁর রাজত্বের তেইশ-চব্বিশতম বৎসরে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষের সময় ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় স্তরে ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা ছিল। এই ত্রাণকার্য যথেষ্ট ছিল না। একটি তাঞ্জোর লেখ থেকে জানা যায় যে, অনশনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য জনৈক বেল্লাল এবং তাঁর দুই কন্যাকে একটি মঠের নিকট আত্মবিক্রয় করতে হয়েছিল।

তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের রাজত্বকালে সামন্ত নরপতিদের সংখ্যা এবং শক্তি, দুই-ই বেড়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে প্রথম রাজরাজ এবং প্রথম রাজেন্দ্রর সময়ের শাসন ব্যবস্থা তখনও বলবৎ ছিল, কিন্তু এই ব্যবস্থার নেপথ্য প্রেরণা আর ছিল না।

তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের পরে তৃতীয় রাজরাজ এবং তাঁর পরে তৃতীয় রাজেন্দ্র রাজা হন। এঁরা দুইজন ১২১৬-১২৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তৃতীয় রাজরাজ হয়ত তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের পুত্র ছিলেন। তৃতীয় রাজেন্দ্রও হয়ত তৃতীয় রাজরাজের পুত্র ছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় রাজারাজের রাজত্বকালে একের পর এক বিপর্যয় ঘটেছিল। তখন দক্ষিণ ভারতের মানচিত্রে গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল। ভিতর এবং বাহির থেকে নানারূপ আঘাত চোলরাজ্যের উপর এসে পড়েছিল। তখন দক্ষিণে পাণ্ড্যগণ এবং পশ্চিমে হোয়সলাগণ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই চোল রাজ্য কোন ক্রমে টিঁকে ছিল। এই দুইটি রাজ্যের মধ্যে, চোলরাজ্য, একটির কুক্ষিগত হক, অন্যরাজ্য তা চাইত না। উত্তর-পশ্চিমে চালুক্য শক্তির অবনতি হয়েছিল। উত্তর-পূর্বে নেল্লোরের তেলেগু-চোড়গণ এবং হোয়সলা ও কাকতীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, তৎকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছিল। প্রতিবেশী কুড়ালুরু এবং শেণ্ডমঙ্গলমের কাড়ব নরপতিগণ চোলদের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণে তৎপর ছিল। সুন্দর পাণ্ড্যের অভিযান এই দুর্বলতাকে প্রকটিত করেছিল। এর ফলে চোলরাজ্যের অধীন সামন্ত নৃপতিগণ সহজেই আনুগত্য পরিবর্তন, অথবা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

তৃতীয় রাজরাজ যখন রাজা হন, তখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই রকম ছিল। তৃতীয় রাজরাজ শুধু দুর্বল ছিলেন না, তিনি নির্বোধ ছিলেন। পাণ্ড্য লেখ অনুসারে তিনি সুন্দর পাণ্ড্যকে কর দিতে অস্বীকার করলে, সুন্দর পাণ্ড্য তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন। রাজরাজ পরাজিত এবং তাঁর রাণী বন্দী হন। তৃতীয় রাজরাজ উত্তরে দ্বিতীয় নরসিংহের হোয়সলা বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে বাধা দেওয়া হয় এবং তেল্লারুর যুদ্ধের পরে কাড়ব কোপ্পারুঞ্জিঙ্গ তাঁকে বন্দী করেন। তাঁর এই বিপর্যয়ের কথা শুনে দ্বিতীয় নরসিংহ দ্রুত তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি কাড়বের মিত্র, মগর (সালেম ও দক্ষিণ আর্কট) রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করে শ্রীরঙ্গমের দিকে অগ্রসর হন। সেখান থেকে তিনি দুইজন সেনাপতিকে কোপ্পারুঞ্জিঙ্গের রাজ্যে ধ্বংসকার্য চালানোর এবং চোল রাজার পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য পাঠান। সেনাপতি দুইজন তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। পেরাম্বলুরের যুদ্ধের পর তাঁরা চিদাম্বরম অভিমুখে অগ্রসর হন। পথে তাঁরা রাজরাজের কর্মচারিবৃন্দ এবং সিংহলের যুবরাজ পরাক্রমবাহু, যাঁরা

Scanned with CamScanner

শত্রুপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের পরাজিত করেন। এইভাবে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় রাজরাজ তাঁর স্বরাজ্যে ফিরে আসেন। ইতিমধ্যে নরসিংহ সুন্দর পাণ্ড্যকে কাবেরী তীরে মহেন্দ্রমঙ্গলমের যুদ্ধে পরাজিত করলে, তিনিও এই ব্যবস্থা মেনে নেন। শেষ পর্যন্ত হোয়সলা, পাণ্ড্য এবং চোলগণের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

তৃতীয় রাজরাজকে এর পরে আর কোন বড় বিপদে পড়তে হয়নি। তিনি অন্তত ১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, তবে তিনি ১২৪৬ খৃষ্টাব্দেই রাজেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এত বিপর্যয় সত্ত্বেও, তাঁর রাজ্যের আয়তন, রাজস্বের শুরুতে যা ছিল, শেষেও তাই ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্য একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে গিয়েছিল। বিশৃঙ্খলা, রাজদ্রোহ, সামন্ত নরপতিদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য রাজার অজ্ঞাতসারে চুক্তি, প্রকাশ্যে রাজকীয় নির্দেশ অমান্য করা ইত্যাদি এই রাজ্যকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছিল। উপরন্তু ১২২০ থেকে ১২৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চোলরাজ্যে, এমনকি পাণ্ড্য রাজ্যে হোয়সলা প্রভাব এত বেড়েছিল যে, এই সময়কে দক্ষিণ ভারতে হোয়সলা আধিপত্যের যুগ বলা যায়।

তৃতীয় রাজেন্দ্র তৃতীয় রাজরাজের তুলনায় অনেক যোগ্য ছিলেন। তিনি চোল রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন এবং সাময়িক ভাবে সফল হয়েছিলেন। সোমেশ্বর হস্তক্ষেপ না করলে, তাঁর সাফল্যের পরিমাণ আরও বেশি হত। ১২৪৬-১২৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চোল রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন তিনিই। এই সময়ের তৃতীয় রাজরাজের লেখ সংখ্যায় কম এবং সেগুলি নেল্লোর এবং উত্তর আর্কটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে তৃতীয় রাজেন্দ্রর লেখ সংখ্যায় অনেক বেশি এবং সেগুলি চোল রাজ্যের সর্বত্র পাওয়া গেছে।

তৃতীয় রাজেন্দ্র প্রথমে দুইজন পাণ্ড্য নৃপতিকে পরাজিত করেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্বল দ্বিতীয় সুন্দর পাণ্ড্য। অন্য জনের পরিচয় অনিশ্চিত। চোলরাজশক্তি এবং পাণ্ড্যদের দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে হোয়সলা সোমেশ্বর পাণ্ড্য পক্ষে যোগ দেন। চোল এবং পাণ্ড্য রাজ্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করাই ছিল হোয়সলাগণের নীতি। যাই হক, এর ফলে, তৃতীয় রাজেন্দ্র তিন বৎসর পর পাণ্ড্যদের উপর তাঁর অধিকার ত্যাগ করতে বাধ্য হন। চোলগণ তখন অন্যত্র মিত্রের সন্ধান করে। টিকক নৃপতি গণ্ডগোপাল এখন চোলদের মিত্র রূপে হোয়সলাগণের বিরোধিতা করেন। তিনি চোলদের শত্রু শম্ভুরাজ এবং অন্যান্যদের পরাজিত করে পরোক্ষভাবে চোল শক্তি বৃদ্ধি করেন, কিন্তু কৃতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ নিজে কাঞ্চী অধিকার করেন।

১২৫১ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত বিজেতা জটাবর্মণ সুন্দর পাণ্ড্য সিংহাসনে

আরোহণ করলে সোমেশ্বরের সঙ্গে তৃতীয় রাজেন্দ্রর আবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু তাদের দুই জনকেই এই সুন্দর পাণ্ড্যের আঘাত সহ্য করতে হয়েছিল। ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি চোল রাজ্যকে করদানে বাধ্য করেন। ১২৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি যুদ্ধে সোমেশ্বরের মৃত্যু হলে হোয়সলা রাজ্য ভাগ হয় এবং বীর রামনাথ দক্ষিণাংশের শাসনভার লাভ করেন। সুন্দর পাণ্ড্যের পরাক্রমের সামনে তৃতীয় রাজেন্দ্র এবং বীররামনাথ ঐক্যবদ্ধ হন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই ১২৭৯ খৃষ্টাব্দের একটি যুদ্ধে সুন্দর পাণ্ড্যের উত্তরাধিকারী কুলশেখরের কাছে পরাজিত হন। এর পরে তৃতীয় রাজেন্দ্র অথবা চোলগণের কথা আর শোনা যায় না। চোল রাজ্য পাণ্ড্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশে যায়। চোলমণ্ডল নামটি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিল। এই নাম থেকেই কোরমণ্ডল নামের উৎপত্তি।

চোলদের শাসন ব্যবস্থা

চোলদের শাসন ব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রধানত লেখর উপর নির্ভর করতে হয়, যদিও এই লেখগুলির ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা সর্বদা একমত নন। বৈদেশিক বিবরণে চোলদের শাসন ব্যবস্থার উপর আলোকপাত বিশেষ পাওয়া যায় না। চোল আমলের মুদ্রা, সংখ্যায় এবং বৈচিত্র্যে খুবই অকিঞ্চিৎকর।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাষ্ট্রকূট রাষ্ট্রবিন্যাসের সঙ্গে চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসের মৌলিক পার্থক্য ছিল। সামন্ত নরপতিগণ চালুক্য-রাষ্ট্রকূট রাজাদের উচ্চাশাকে খর্ব করতেন। একমাত্র চোলগণই দীর্ঘকাল ধরে সামন্ত নরপতিদের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ব্যাপকভাবে কৃষকদের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল।

সঙ্গম যুগের মত চোল আমলেও রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ভারতের আদিম রাজতন্ত্র এবং চোলদের রাজতন্ত্র, প্রকৃতিতে এক ছিল না। অসংখ্য প্রাসাদ এবং কর্মচারি, ও বিভিন্ন জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ এই রাজতন্ত্র বাইজানটাইন রাজতন্ত্রের সঙ্গে তুলনীয়। চোলদের সময় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। এই পরিণতির সঙ্গে সংগতি রেখে চোল রাজাদের অভিধাও পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁরা 'চক্রবর্তিগল' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। রাজরাজের সময় প্রতিটি প্রস্তর লেখতে রাজত্বের প্রধান ঘটনাবলী ভূমিকা হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হত। এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শাসকের পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা পরিস্ফুট হয়েছিল। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বর মন্দিরকেও এই সচেতনতার প্রতীক বলা যায়। স্থাপত্য

Scanned with CamScanner

শিল্পে এই মন্দিরের স্থান যেমন অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় অনেক উঁচুতে ছিল, দক্ষিণ ভারতেও তেমনই পূর্বতন সাম্রাজ্যের তুলনায় চোল সাম্রাজ্যের গৌরব ও সমৃদ্ধি অনেক বেশি ছিল। এই গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে রাজধানীও পরিবর্তিত হয়েছিল। বিজয়ালয়ের রাজধানী ছিল তাঞ্জোরে। পল্লবদেশ জয়ের পর কাঞ্চী দ্বিতীয় রাজধানী রূপে গড়ে উঠেছিল। রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ড চোলপুরম নতুন রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন। রাজেন্দ্র চোল মাদুরা এবং অন্য কয়েকটি স্থানে বিরাট রাজপ্রাসাদও তৈরি করেছিলেন। এই নগরগুলিতে মন্দির এবং রাজসভার বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

রাজপ্রাসাদে অসংখ্য ভৃত্য ও দেহরক্ষী ছিল। ধনাগার এবং রত্নশালার জন্য মহিলারা নিযুক্ত হতেন। অনেক সময় যুদ্ধ বন্দী স্ত্রী-পুরুষের মধ্য থেকে ভৃত্যদের নিযুক্ত করা হত। রাজকীয় ভোজসভায় অসংখ্য নর্তকী উপস্থিত থাকত। রাজা, রাণী, তাঁদের আত্মীয়বর্গ, উচ্চপদস্থ কর্মচারি এবং ব্যবসায়ীগণ মন্দির প্রতিষ্ঠা, জমি-উদ্ধার, জলসেচ, বিদ্যায়তন, চিকিৎসালয়, ইত্যাদির জন্য উদার হস্তে অর্থ দান করতেন। চোল রাজারা নানাভাবে যে রাজস্ব আদায় করতেন, তা বহুলাংশে এই সব দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করা হত। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের দিকে চোল রাজাদের মন ছিল না। এক মাত্র রাজাধিরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন। চোল রাজারা যজ্ঞের চেয়ে দানকেই পছন্দ করতেন।

চোল রাজারা শৈব ছিলেন। শৈব ধর্মে গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। তাই সব চোল রাজাদের রাজগুরু ছিলেন। উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে পুরোহিতের যে স্থান ছিল, এই রাজগুরুদের স্থান ছিল তার চেয়ে স্বতন্ত্র। তাঁরা শুধু ধর্মীয় ব্যাপারেই নয়, জাগতিক ব্যাপারেও রাজাদের পরামর্শ দিতেন।

নানাভাবে দেব-রাজা পূজাকে উৎসাহিত করা হত। মৃত রাজার নামাঙ্কিত মন্দির নির্মাণ করা হত। প্রথম পরন্তক কর্তৃক নির্মিত আদিত্যেশ্বর মন্দির এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম রাজরাজ এবং প্রথম রাজেন্দ্র অনুরূপ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। অনেক সময়ে মৃত অথবা জীবিত রাজা ও রাণীর মূর্তি নির্মাণ করে মন্দিরে স্থাপন করা হত। তাঞ্জোরের মন্দিরে দ্বিতীয় পরন্তকের মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর কন্যা কুন্দবাই এর পূজার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঞ্জোরের এবং কালহস্তির মন্দিরে রাজেন্দ্র এবং চোল মহাদেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে।

সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর শীর্ষে ছিলেন রাজা। প্রতি বাহিনীর নিজস্ব নাম ছিল। রাজরাজের সময়ের ৭০টি সেনাবাহিনীর নাম পাওয়া গেছে। প্রতিটি বাহিনীর নিজস্ব জীবন ছিল। বাহিনীগুলি দান কার্যে

অংশ গ্রহণ করত এবং নিজেদের নামে মন্দির নির্মাণ করত। তাদের সংগঠন এবং সামরিক কার্যকলাপের চেয়ে বেসামরিক কর্মকাণ্ডের কথা বেশি করে জানা যায়। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন অংশ ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হস্তিবাহিনী, অশ্বারোহী ও পদাতিকবাহিনী, তীরন্দাজ ও বর্শাধারী বাহিনীর কথা বলা যায়। সেনাবাহিনী বিভিন্ন দুর্গে এবং সামরিক ছাউনিতে ছড়িয়ে থাকত। প্রথম কুলোত্তুঙ্গ প্রসঙ্গে একটি সামরিক উপনিবেশ স্থাপনের কথা বলা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যগণ কীভাবে নিযুক্ত হতেন, জানা যায় না। তবে সেনাপতিদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেনাবাহিনীর বেসামরিক কাজের মধ্যে মন্দির রক্ষা, এবং রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতার কথা বিভিন্ন লেখতে পাওয়া যায়। সেনাবাহিনীর সাহায্যে যে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হত, তা রাজার হাতে আসত। তিনি ইচ্ছামত সেগুলি ব্যবহার করতেন। চোল রাজারা যে তাঁদের দানকার্যের বেশির ভাগই এই লুণ্ঠিত ধনৈশ্বর্য থেকে করতেন, তাঁদের লেখতে এই সত্যকে তাঁরা গোপন করেন নি।

যে নৌবহরের সাহায্যে রাজেন্দ্র চোল শ্রীবিজয় জয় করেছিলেন, তা অকস্মাৎ সৃষ্ট হয়নি। চোল রাজাদের একটি নির্দিষ্ট নৌ-নীতি ছিল এবং এই নৌবহর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। ইতিপূর্বে বিভিন্ন চোল রাজাদের প্রসঙ্গে তাঁদের নৌ-সাফল্যের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা থেকে তাঁদের নৌবহরের যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিভিন্ন বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ রাজার কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করতেন, তিনি সে সম্পর্কে মৌখিক আদেশ দিতেন। সচিবগণ এই প্রতিবেদনের বিষয় এবং রাজার আদেশ লিখে নিতেন। রাজকীয় আদেশের অনুলিপি তখন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় অথবা স্থানীয় শাসন কর্তাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হত। প্রতিবেদন পেশের স্থান ও কাল, সংশ্লিষ্ট কর্মচারির নাম, ইত্যাদি সম্বলিত রাজাদেশ, সাধারণত মন্দির প্রাচীরে টাঙানো হত। রাজা কোন অর্থেই আইন প্রণেতা ছিলেন না। তিনি কেবল সামাজিক জীবন এবং বিধানের অভিভাবক ছিলেন। চোল আমলে মন্ত্রী-পরিষদের অস্তিত্বের কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চোলগণ একটি সুগঠিত ও সুনিপুণ আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন শাসন পরিচালনা বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। চোলদের কেন্দ্রীয় কর্মচারিগণ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতেন, কিন্তু স্বাধীনতা এবং উদ্যোগকে খর্ব করতেন না। রাষ্ট্রীয় কাজ এবং বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর কাজের মধ্যে ভারসাম্য তাঁরা নিপুণভাবে রক্ষা করেছিলেন। চোলদের রাষ্ট্র-বিন্যাসে ব্যক্তিবিশেষের কোন স্থান ছিল না।

রাজকীয় কর্মচারিদের মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদ এবং তাঁদের বিভিন্ন অভিধা

Scanned with CamScanner

ছিল। এই অভিধাগুলি সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে তাঁদের এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে, পার্থক্য সূচিত করত। সামরিক এবং বেসামরিক বিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয় বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের 'অদিগারিগল' বলা হত। উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের সাধারণত 'পেরুন্দরম' এবং নিম্নপদস্থ কর্মচারিদের 'সিরুদনম' বলা হত। উভয় শ্রেণীর মধ্যবর্তী কর্মচারিদের বলা হত 'সিরুদনত্তুপ-পেরুন্দরম'। সেনাপতিগণও এই শ্রেণীভুক্ত বিবেচিত হতেন। বিভিন্ন পদ বংশানুক্রমিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল।

সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ প্রথা কী ছিল, জানা যায় না। জন্ম ও বংশ কৌলীন্যকে অবশ্যই মর্যাদা দেওয়া হত। কর্মজীবনে উন্নতির জন্য যোগ্যতাকে বড় করে দেখা হত। যে রাষ্ট্রবিন্যাসে সিংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে যোগ্যতার স্থান ছিল এত বড়, সেখানে কর্মচারিদের উন্নতি যে যোগ্যতার উপর নির্ভর করত, এমন অনুমান করা যায়। কর্মচারিগণ তাঁদের প্রাপ্য নগদ অর্থে পেতেন না। তাঁদের ভূমি দান করা হত। এই জমি থেকে তাঁদের যা আয় হত, তার একাংশ তাঁরা দ্রব্যের মাধ্যমে, অন্যাংশ অর্থের মাধ্যমে নিতেন। ভূমিদান বলতে মালিকানা স্বত্ব দান করা বোঝাত না। জমিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি অধিকারের হস্তান্তর বোঝাত। জমির মালিকানা ছিল ব্যক্তি বিশেষের, অথবা গ্রাম সম্প্রদায়ের হাতে। এই ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তা এবং দুর্নীতির সুযোগ ছিল। সংকার ভূমির অধিকার সম্পর্কিত লেখ্যগুলি নিপুণভাবে রক্ষা করতেন। তাছাড়া গ্রামের জনমতও এই ব্যবস্থার পবিত্রতা রক্ষায় সাহায্য করত। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার প্রধানরূপে রাজা রাজ্য পরিক্রমা করতেন এবং প্রয়োজন হলে, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেন। কেন্দ্রীয় কর ভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও কয়েকটি কর আদায়ের সুবিধা ভোগ করত। দ্বিতীয় রাজেন্দ্রর আদেশ থেকে জানা যায় যে, এই অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানের অধীন ছিল।

শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তরে ছিল স্ব-শাসিত গ্রাম। কতকগুলি গ্রামের সমষ্টিকে বলা হত কুরুম অথবা নাড়ু অথবা কোট্টম। বড় গ্রাম, যা একাই হয়ত একটি কুরুম বিবেচিত হত, তাকে বলা হত তনিয়ুর। মধ্য যুগের ইংলণ্ডের 'বরো'র সঙ্গে এগুলি তুলনীয়। কয়েকটি কুরুম নিয়ে একটি বলনাড়ু গঠিত হত। বলনাড়ুর উপরে ছিল 'মণ্ডলম' অথবা প্রদেশ। এগুলিই ছিল রাষ্ট্রবিন্যাসের বৃহত্তম বিভাগ। রাজরাজ চোলের রাজত্বকালের শেষে, সিংহলসহ এই মণ্ডলমের সংখ্যা ছিল আট কি নয়। চোল রাজত্বে এই সংখ্যা আর বাড়ে নি।

চোল আমলে ভূমিকরই ছিল রাষ্ট্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস। এই কর

নগদ অর্থে অথবা দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। আমদানি রপ্তানী শুল্ক, নগরের প্রবেশদ্বারে দেয় শুল্ক এবং খনি অরণ্য প্রভৃতি থেকে রাজস্ব আসত। বিষ্টিরও প্রচলন ছিল। সব মিলিয়ে করের বোঝা খুবই ভারি ছিল। তা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য অনেকে স্থান ত্যাগ করত। কোন অঞ্চল থেকে ব্যাপক ভাবে স্থান ত্যাগের আশঙ্কা কর সংগ্রহকারীকে সতর্ক রাখত।

সংগৃহীত রাজস্ব থেকে শাসনকার্যের ব্যয় বহন করা হত। অবশিষ্ট অংশ রাজা ইচ্ছামত ব্যয় করতেন। রাজ পরিবারের ভরণপোষণ এবং জাঁকজমকের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হত। কখনও যুদ্ধের জন্য, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মন্দিরের প্রয়োজনে বিশেষ কর ধার্য করা হত। অনেক সময় স্থানীয় সমিতি, কখনও বা রাজা করের দায় থেকে অব্যাহতি দিতেন। কখনও বা একসঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ বেশি কর দিয়ে, ভবিষ্যতে কর দেওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত।

গ্রাম থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য ভূমি করের জন্য গ্রাম সভাগুলি দায়ী থাকত। যুদ্ধ এবং মন্দিরের প্রয়োজনে ছাড়াও বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধের সংস্কার কার্যের জন্য অতিরিক্ত কর ধার্য করা হত। সর্বদা অতিরিক্ত কর ধার্য করার আগে করদাতাদের সম্মতি নেওয়া হত।

জমি এবং বাড়ি ছিল করের মুখ্য উপাদান। তাই নিপুণ ভাবে জমি জরিপের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম রাজরাজের রাজত্বের মধ্যভাগে এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। পরবর্তী চোল রাজাদের একাধিক লেখতে এর উল্লেখ আছে। ভূমি রাজস্বের হার কী ছিল, সঠিক জানা যায় না, হয়ত এক তৃতীয়াংশ ছিল। তবে জমির উর্বরতা অনুসারে এই হারের তারতম্য ঘটত। কৃষি জমির উর্বরতা এবং উৎপন্ন ফসল পরিবর্তিত হলে, করের হারও নতুন ভাবে নির্ধারণ করা হত। প্রথম রাজরাজের তাঞ্জোর লেখতে স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রতি গ্রামে কিছু পরিমাণ জমি থাকত (যেমন বাসস্থান, মন্দির, পুকুর, খাল, শ্মশান ইত্যাদি) যার উপর কোন প্রকার কর ধার্য করা হত না। গ্রামের সমগ্র এলাকা থেকে এই অঞ্চলগুলি বাদ দিয়ে, অবশিষ্ট পরিমাণ জমি করযোগ্য মনে করা হত। দেয় কর কঠোর ভাবে আদায় করা হত। পরবর্তীকালে করদাতাদের অনাভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্থানীয় নরপতিগণ তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে আগ্রাহ্য করে, নানা উপায়ে অর্থ আদায় করতেন। অস্বাভাবিক করের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত একেবারে ছিলনা, এমন নয়। বাকি কর আদায়ের জন্য জমি ক্রোক অথবা বিক্রয় করা হত। অনেক সময় মন্দিরকে পর্যন্ত কর দেওয়ার জন্য জমি বিক্রয় করতে হত।

চোল আমলের কর ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের উপর যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, নানা প্রকার সামাজিক ব্যয়ের মধ্য দিয়ে তা কমানো হত। চোল রাজাদের

Scanned with CamScanner

কাছে এবং বিভিন্ন মন্দিরে প্রচুর সম্পদ সঞ্চিত থাকত। তবে তাঁদের ব্যয়ের পরিমাণও ছিল প্রচুর। ধনী ব্যক্তিরা মঠ-মন্দির, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় করে সামাজিক খ্যাতি অর্জন করতে চাইতেন। যে মন্দিরগুলি একদা বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল, চোল আমলে সেই মন্দির-গুলিই ছিল দুর্গত মানুষের একমাত্র আশ্রয় ও ভরসার স্থল।

বিচারের কাজ সাধারণত স্থানীয় ভাবে করা হত। গ্রামসভাগুলির বিচার সম্পর্কিত ব্যাপক ক্ষমতা ছিল। রাজকীয় আদালতগুলিকে সম্ভবত 'ধর্মাসন' বলা হত। ধর্মাসনগুলিতে যে সব মামলা বিচারের জন্য আনা হত, সেগুলি নিষ্পত্তির জন্য আইনজ্ঞ ব্রাহ্মণদের (ধর্মাসন-ভট্ট) সাহায্য নেওয়া হত। দেও-য়ানি এবং ফৌজদারি অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। সাধারণ ভাবে সব অপরাধেরই বিচার গ্রাম সভাগুলিতে হত। সেই বিচারে সন্তুষ্ট না হলে, মামলা নাড়ুর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির কাছে আনা যেত। উচ্চতর আদালতে সচরাচর আপীল করা হত না। দেওয়ানি মামলার নিষ্পত্তিতে অনেক সময়ে খুবই বিলম্ব হত। চুরি, ব্যভিচার, জালিয়াতি ইত্যাদি অপরাধকে গুরুতর মনে করা হত। এই সব অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রাম সভায় প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজদ্রোহের বিচার রাজা নিজে করতেন। শাস্তি হিসাবে অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত, অথবা তাকে মৃত্যু দণ্ড দেওয়া হত। সাধারণ অপরাধের জন্য জরিমানা দিতে, অথবা কারাদণ্ড ভোগ করতে হত। দাঙ্গা (কলহম) এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটনোর জন্য জরিমানার পরিমাণ ছিল খুব বেশি, ২০,০০০ কাশু পর্যন্ত। শিবদ্রোহ, অর্থাৎ মন্দিরের সম্পত্তি নষ্ট করলে, অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মন্দিরের ক্ষতিপূরণ করা হত। রাজা বা তাঁর নিকট আত্মীয়ের উপর আক্রমণ হলে, রাজা স্বয়ং সেই অপরাধের বিচার করতেন। প্রথম রাজরাজের সময় এই অপরাধের জন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে গরু চুরি ছিল একটি সাধারণ অপরাধ এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ ছিল না। চৈনিক লেখক চৌ-জু-কুয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চোলদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, লঘু অপরাধে অপরাধীকে একটা কাঠের সঙ্গে বেঁধে ৫০, ৭০ অথবা ১০০টি বেত্রাঘাত করা হত। জঘন্য অপরাধের জন্য অপরাধীর শিরশ্ছেদ করা হত, অথবা তাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলে মারা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নরহত্যার জন্য অপরাধীকে শাস্তি হিসাবে নিকটতম মন্দিরে স্থায়ীভাবে একটি প্রদীপ জ্বালানোর দায়িত্ব দেওয়া হত দেখে, অনেকে চোলদের শাস্তিদান ব্যবস্থাকে অতিশয় লঘু বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু উপরের বর্ণনা থেকে এই ধারণা খুব সঙ্গত মনে হয় না।

চোলদের রাষ্ট্রবিন্যাসের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সেদিক থেকে চোলদের শাসন

ব্যবস্থার সঙ্গে গুপ্তদের শাসন ব্যবস্থার বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কিন্তু চোলদের গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি ভিন্ন ছিল। চোলগণ গ্রাম পর্যায়ে যে স্বাধীনতা ভোগ করত, তদানীন্তন কালে তাকে অভূতপূর্ব বলা যায়। চোলদের সরকারি কর্মচারিগণ গ্রামীণ ব্যাপারে দর্শক এবং উপদেষ্টা হিসাবে অংশগ্রহণ করতেন, শাসক হিসাবে করতেন না। এর ফলে উপরের স্তরে রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, তামিল অঞ্চলের সমাজ জীবনে ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল। চোল আমলে যে গ্রাম শাসন ব্যবস্থা আমরা দেখি, আগেই তার সূচনা হয়েছিল। অষ্টম এবং নবম শতাব্দীর পাণ্ড্য ও পল্লবগণের লেখতে অনুরূপ শাসন ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সে শাসন ব্যবস্থা চোলদের মত এত পরিণত ছিল না।

গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের দ্বারা গঠিত প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে গ্রাম শাসনই ছিল গ্রামীণ সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। এই সমিতিগুলি ভিন্ন অনেকগুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী ছিল। প্রতি গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট কাজ ছিল, অথবা তাকে একটি প্রতিষ্ঠান বিশেষের দেখাশোনা করতে হত। সমাজ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে আইনত এই সমিতি এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিশেষ ভেদ ছিল না। কিন্তু কার্যত জাতীয় জীবনে তাদের গুরুত্ব ভিন্ন ছিল। গোষ্ঠীগুলি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়ে থাকত। সেই তুলনায় গ্রাম সমিতির কর্তব্য এবং দায়িত্ব ছিল অনেক ব্যাপক। গোষ্ঠী যে নির্দিষ্ট বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিল, সেই বিষয়ও সমিতির দায়িত্ব থাকত এবং কোন কারণে গোষ্ঠী ব্যর্থ হলে সমিতির কাছে আবেদন করা যেত। গোষ্ঠীর সদস্যগণ সমিতিরও সদস্য হতেন। তার ফলে গোষ্ঠী ও সমিতির মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা ছিল না। গ্রামগুলি বিভিন্ন পাড়ায় বিভক্ত হত। প্রতিটি পাড়ার মানুষ বিশেষ উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী গঠন করত। সূত্রধর, স্বর্ণকার, কর্মকার, ধোপা ইত্যাদি বৃত্তিজীবী মানুষের দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীর দৃষ্টান্তও বিরল ছিল না।

গ্রাম সমিতি ছিল দুইটি, উর এবং সভা। তাছাড়া শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের জন্য স্থানীয় সমিতি ছিল। তাকে বলা হত নগরম। এই সবগুলিই ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাথমিক সমিতি। এরা মোটামুটি ভাবে সাধারণ বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রণ করত। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণ মাঝে মাঝে তাদের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করতেন। অন্যথায় তারা নিজেদের কাজ নিজেরাই করত। এই সমিতিগুলি যখন তাদের সংবিধান পরিবর্তন অথবা ভূমিস্বত্ব পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, তখন কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিগণ তাদের অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন। তবে তাঁরা কতটা প্রভাব বিস্তার করতেন, তা বলা যায় না।

স্থানীয় সমিতিগুলির মধ্যে উর ছিল সবচেয়ে সহজ ও সরল। অনেক

Scanned with CamScanner

স্থানে উর সভার পাশাপাশি থেকে কাজ করত। প্রয়োজন অনুসারে উর এককভাবে, অথবা সভার সঙ্গে যৌথভাবে কার্য নির্বাহ করত। অনেক স্থানে উরই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। গ্রামের করদাতাদের নিয়ে উর গঠিত হত।

চোলদের লেখতে সভা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সর্বত্র এই সভা ব্রাহ্মণ-গ্রাম, অর্থাৎ চতুর্বেদিমঙ্গলমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজারা তাঁদের দানের দ্বারা অনেক মঙ্গলম সৃষ্টি করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান তখন পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হত। এইভাবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল এবং এই উপনিবেশগুলিতে ব্রাহ্মণগণ সভার মাধ্যমে স্থানীয় কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন। কোথাও ব্রাহ্মণদের নতুন বসতি স্থানীয় প্রাচীন বাসিন্দাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলে, সেখানে উর এবং সভা দুই-ই পাশাপাশি থাকত। কখনও বা একই গ্রামে দুইটি উর থাকত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, ১২২৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় সন্তমঙ্গলম গ্রামে দুইটি উর ছিল, একটি গ্রামের হিন্দু অংশের বাসিন্দাদের এবং অন্যটি জৈন অংশের বাসিন্দাদের।

উর কী ভাবে গঠিত হত, সঠিক জানা যায়। গ্রামের প্রাপ্তবয়স্ক করদাতাদের দ্বারা গঠিত হলেও উরের আলোচনায় বয়স্করাই প্রাধান্য ভোগ করতেন। প্রতি উরে একটি শাসন পরিচালনা বিভাগ ছিল। এই বিভাগে সদস্য সংখ্যা কত ছিল এবং তাঁরা কী ভাবে নিযুক্ত হতেন, জানা নেই।

সভা অথবা মহাসভার স্থানীয় শাসন যন্ত্র তুলনায় অনেক বেশি জটিল। সাধারণ ভাবে এই মহাসভা বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সমিতির মাধ্যমে কাজ চালাত। এই কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির পূর্ব ইতিহাস জানা নেই। তবে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সমিতিগুলি গঠিত হয়েছিল। চোল আমলের প্রথম দিকের কোন কোন লেখতে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য অস্থায়ী সমিতি গঠনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিভিন্ন মহাসভায় সমিতির সংখ্যা এবং তাদের সদস্যদের নিয়োগ পদ্ধতিও ছিল বিভিন্ন। মহাসভা সম্পর্কিত বেশির ভাগ লেখ তোণ্ডমণ্ডলম এবং চোলমণ্ডলমে পাওয়া গেছে। এই লেখগুলির মধ্যে প্রথম পরান্তকের রাজত্বকালের যথাক্রমে ৯১৯ ও ৯২১ খৃষ্টাব্দের দুইটি লেখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই লেখ দুইটি চিঙ্গেলপুট জেলার উত্তরমেরুর গ্রামে পাওয়া গেছে। এই লেখ দুইটিতে বিভিন্ন কার্যনির্বাহ সমিতির গঠন সম্পর্কিত ব্যবস্থার বর্ণনা আছে। প্রথম লেখটিতে যে ব্যবস্থার উল্লেখ আছে, তা সন্তোষজনক মনে না হওয়ায়, দ্বিতীয় লেখ দ্বারা তা সংশোধিত হয়েছিল। কার্যনির্বাহী সমিতির এই সংশোধিত রূপে চোল রাজ্যের পক্ষে প্রতিনিধিস্থানীয় মনে করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উভয় ক্ষেত্রেই যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, তা গ্রহণের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারি উপস্থিত ছিলেন।

৯২১ খৃষ্টাব্দের লেখ অনুসারে উত্তরমেরুর গ্রামের তিনটি কুডুম্ব অথবা পাড়া থেকে কার্যনির্বাহী সমিতিগুলির জন্য প্রথমে যোগ্য ব্যক্তিদের মনোনীত করা হত। এই যোগ্যতার মাপকাঠি বেশ উঁচু ছিল। লেখটিতে মনোনয়নের জন্য কে যোগ্য এবং কে অযোগ্য দুই-ই বলা হয়েছে। যোগ্য হতে গেলে প্রায় দেড় একর পরিমাণ কর-দেয় জমি, স্বস্থানে স্বনির্মিত বাসগৃহ, ৩৫ থেকে ৭০ এর মধ্যে বয়স এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন হত। একটি বেদ এবং চারটি ভাষ্যের মধ্যে একটি ভাষ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে, ন্যূনতম জমির পরিমাণ অর্ধেক হলেও ক্ষতি ছিল না। যাঁরা পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে কোন সমিতির সদস্য ছিলেন, যাঁরা সমিতির সদস্য হিসাবে প্রয়োজনীয় হিসাব পেশ করতে পারেন নি, তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়বর্গ, যাঁরা অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত, তাঁরা এবং আত্মীয়গণ এবং যাঁরা অন্যের দ্রব্য চুরির অপরাধে অভিযুক্ত, তাঁরা মনোনয়ন পেতেন না। অনুরূপ আরও অযোগ্যতার বর্ণনা এই লেখতে আছে। এইভাবে মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে, প্রতি কুডুম্বের জন্য একজন হিসাবে তিনজন লটারির মাধ্যমে নিযুক্ত হতেন। এই তিনজনের মধ্যে যারা জ্ঞানী এবং বয়স্ক এবং যাঁদের ইতিপূর্বে উদ্যান অথবা পুষ্করিণী সমিতিতে কাজের অভিজ্ঞতা ছিল, এমন বারো জনকে দিয়ে সম্বৎসরক সমিতি গঠিত হত। অবশিষ্ট বারোজন উদ্যান-সমিতি এবং ছয়জন, পুষ্করিণী সমিতি গঠন করতেন। আরও দুইটি সমিতি, স্থায়ী সমিতি এবং স্বর্ণ-সমিতি, অনুরূপ-ভাবে গঠিত হত। চোল আমলের স্বর্ণ মুদ্রার গুণগত দিক থেকে আশুলিক বৈষম্য দেখা দেওয়ায়, স্বর্ণ সমিতি গঠনের প্রয়োজন হয়েছিল। সমিতির সদস্যগণ এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হতেন এবং তাঁরা কোন বেতন বা পারিশ্রমিক পেতেন না। শুধুমাত্র লটারির মাধ্যমে নিযুক্ত করা হলে, অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগের সম্ভাবনা ছিল। তাই প্রাথমিক মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চোলদের অন্যান্য লেখতে মোটামুটিভাবে অনুরূপ পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য যোগ্যতা এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ, সর্বদা এক ছিল, একথা বলা যায় না। ঢোল বাজিয়ে মহাসভার অধিবেশন আহ্বান করা হত। সাধারণত মন্দির প্রাঙ্গনে অধিবেশন বসত। বিভিন্ন মহাসভার মধ্যে বিনিময় এবং সহযোগিতা অজানা ছিল না।

মহাসভার করণীয় কাজ থেকে চোল আমলে গ্রাম-স্বরাজের পরিমাপ করা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহাসভা বিভিন্ন সমিতি গঠন করতে পারত। গ্রাম সম্প্রদায়ের জমির উপর মহাসভার মালিকানাস্বত্ব ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মহাসভার নিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল। অরণ্য এবং পতিত জমি উদ্ধারের সঙ্গে মহাসভা যুক্ত ছিল। উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ এবং রাজস্ব নির্ধারণের কাজে মহাসভা রাজকীয় কর্মচারি-

Scanned with CamScanner

দের সঙ্গে সহযোগিতা করত। নির্ধারিত রাজস্ব মহাসভা আদায় করত। রাজস্ব আদায় না হলে, নীলামে জমি বিক্রয়ের অধিকার মহাসভার ছিল। মহাসভা জমি এবং জলসেচ অধিকার-সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করত। সাধারণ ভাবে জমি জরিপের দায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে জমির শ্রেণী বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটাতে হলে মহসভার সম্মতি নিতে হত। গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য কর ধার্য করার অধিকার মহাসভার ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুষ্করিণী খননের কথা বলা যায়। এই কর থেকে সংগৃহীত অর্থ, রাষ্ট্রের জন্য সংগৃহীত কর থেকে আলাদা রাখা হত। নির্দিষ্ট কারণে মহাসভা যে কোন ব্যক্তিকে এই বিশেষ কর থেকে অব্যাহতি দিতে পারত। দান এবং কর সংক্রান্ত লেখ্যগুলি, মহাসভা রক্ষা করত। পথ-ঘাট এবং পুষ্করিণী সহ সব রকম জলসেচ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল মহাসভার উপর। সীমিত অর্থ সামর্থ্যের মধ্যে মহাসভা বিদ্যাচর্চার ব্যবস্থা করত। মহাসভার একটি সমিতি, ন্যায়স্তার, বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করত।

রাজা এবং গ্রামের মধ্যে, রাজকীয় কর্মচারী, অধিকারি ভিন্ন, সামন্তগণ ছিল। সামন্তদের সঙ্গে রাজার দম্পর্ক নিয়ে মহাসভাকে মাথা ঘামাতে হত না। রাজস্ব আদায় করে, তাঁর রাষ্ট্রীয় অংশ রাজার কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল সামন্তদের প্রধান কাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে রাজস্ব আদায় করত মহাসভা।

ঊর এবং সভা অথবা মহাসভার মত আর একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। তাকে 'নগরম' বলা হত। কার্যাবলীর দিক থেকে ঊর এবং সভার সঙ্গে নগরমের বিশেষ মিল ছিল। কোন কোন স্থলে ঊর এবং নগরম পাশাপাশি থেকে তাদের কাজ করত। সম্ভবত নগরম ছিল ব্যবসায়ীদের একটি প্রাথমিক সমিতি। গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে নগরম অন্যতম স্থানীয় প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠেছিল। যেখানে বাণিজ্য স্বার্থ প্রধান্য অর্জন করেছিল, সেখানে নগরমই ছিল একমাত্র স্থানীয় প্রতিষ্ঠান। অনেকে নগরমকে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্ঘ অথবা গিল্ড বলে বর্ণনা করেছেন। এই গিল্ডগুলি, বিভিন্ন দ্রব্য যেখানে উৎপন্ন হত, সেখানে কিনত এবং পরে তা অন্যত্র বণ্টন করত। তারা বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত, কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সমর্থনের নিশ্চিত আশ্বাস ছিল না। তবে প্রয়োজন হলে, যেমন শ্রীবিজয়ের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র ব্যবসায়ীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানেও নতুন বাজার দখল করা, চোল রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল না। অন্য একটি দেশ বাণিজ্যের পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল, চোল রাজারা তা দূর করতে চেয়েছিলেন। অবশ্য রাজা এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ এই বাণিজ্যে অর্থ লগ্নী করতেন। কোন কোন বণিক সঙ্ঘের সম্পদের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, তার পক্ষে

সমগ্র গ্রাম কিনে নিয়ে মন্দিরকে দান করা অসম্ভব ছিল না। ননদেশি গিল্ড দক্ষিণ ভারতে এবং সুমাত্রায় ব্যাপক ভাবে বাণিজ্য করত। এই গিল্ডগুলিতেও ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রভাব ছিল। চোল রাজারা ব্রাহ্মণদের উদার ভাবে জমি দান করেছিলেন। তাই হয়ত গিল্ডের সদস্য হিসাবে এই ব্রাহ্মণগণ রাজার রাজনৈতিক প্রভুত্বের বিরোধিতা করেন নি।

ইতিপূর্বে আঞ্চলিক বিভাগ হিসাবে যে নাড়ুর কথা বলা হয়েছে, তারও নিজস্ব সভা ছিল এবং এই সভাগুলি ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। নাড়ুর সভাকে 'নাত্তার' বলা হত। রাজরাজ নেগপতমের বৌদ্ধ মন্দিরের জন্য যে আনৈমঙ্গলম গ্রাম দান করেছিলেন, সেই সম্পর্কিত আদেশ, অন্যান্যদের মধ্যে, পত্তিনককুররম-এর নাত্তারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এই নাত্তার কী ভাবে গঠিত হত, তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তবে এখানে যে গ্রাম দানের কথা বলা হল, তাতে সাক্ষরকারীদের নামের তালিকা থেকে মনে হয় যে, নাড়ুর অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধি নিয়ে নাত্তার গঠিত হত এবং এখানে অন্যান্যদের মধ্যে হিসাবরক্ষকগণও উপস্থিত থাকতেন। এই নাত্তারগুলি বিচারের ক্ষেত্রে অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মচারিদের সঙ্গে সহযোগিতা করত। তামিল লেখগুলির 'নগরম' ও নাড়ুর সঙ্গে, সংস্কৃত সাহিত্যের 'পৌর' ও 'জনপদের,' অন্তত নামের দিক থেকে বিশেষ মিল দেখা যায়।

উপরে যে প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলা হল, তাদের কর্ম পদ্ধতির বিবরণ কোন লেখতে নেই। কোন অধিবেশনে ন্যূনতম সদস্যদের উপস্থিতি দাবি করা হত না। কোন বিষয়ে ভোট গ্রহণের রীতিও ছিল না। কোন একটি বিষয় নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচনা করা হত। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে এই আলোচনায় অংশ নিতেন। বিষয়টির সঙ্গে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ যুক্ত থাকলে, সেই শ্রেণীর প্রতিনিধিদের বক্তব্য শোনা হত। তার পরে সকলের সম্মতি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হত। ক্ষুদ্র উপদলীয় স্বার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করলে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতার অভাব ছিল না। তিরুভামাত্তুরের মন্দিরের সেবকদের পারিশ্রামিক যে সভায় স্থিরীকৃত হয়েছিল, তাতে মন্দিরের সেবকগণও উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অন্তত একটি ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দুইটি গ্রামের মিলিত সভার অধিবেশনে দুইটি গ্রামকে এক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। প্রথম পরান্তকের রাজত্বকালে, ৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরি না জানিয়েও, দুইটি গ্রাম এক হতে পেরেছিল। এই ঘটনা থেকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা স্বাধীনতা ভোগ করত, তা বোঝা যায়। ব্রহ্মদের

Scanned with CamScanner

অথবা দেবদাসকে কার্যকর করার জন্যও সংগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতার প্রয়োজন হত।

গ্রাম শাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুইজন গ্রামীণ কর্মচারির উল্লেখ চোলদের লেখতে পাওয়া যায়। এঁরা হলেন 'মধ্যস্থ' এবং 'করণত্তার'। চোলদের লেখতে 'মধ্যস্থ' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, মনে হয়। মধ্যস্থগণ যে বিরোধের মীমাংসা করতেন, তা মনে হয় না। গ্রামা রাজনীতিতে এই কর্মচারিগণ নিরপেক্ষ থাকতেন বলে হয়ত তাঁদের মধ্যস্থ বলা হত। তাঁরা মহাসভার অধিবেশনে উপস্থিত থাকতেন, কিন্তু আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন না। তাঁদের কর্তব্য এবং পারিশ্রমিক মহাসভা নির্ধারণ করত। করণত্তার ছিলেন হিসাব পরীক্ষক। মনে হয় তাঁদের জমির সীমার উপরও নজর রাখতে হত। ১২৩৪ খৃস্টাব্দে সভা একজন হিসাবপরীক্ষককে বরখাস্ত করেছিল এবং তাঁর বংশধর অথবা আত্মীয়গণ এই পদে নিযুক্ত হতে পারবে না বলে ঘোষণা করেছিল। এই ঘটনা থেকে গ্রাম শাসনের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সভা কতটা সচেষ্ট ছিল, তা বোঝা যায়। গ্রামসভাগুলি দাতাদের যোগ্য স্বীকৃতি দিয়ে গ্রামের কল্যাণ সাধনে ব্যক্তিগত দানকে উৎসাহিত করত। ১১২৯ খৃস্টাব্দের একটি লেখতে তিরুমুক্কুদল গ্রামের সভা, গ্রামের দুর্গতির দিনে উদারতা প্রদর্শনের জন্য জনৈক ভট্টের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উত্তরমেরুর গ্রামের সভা, স্থানীয় বিষ্ণু মন্দিরের সংস্কার সাধনের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে বংশানুক্রমিক সুযোগ সুবিধা দান করেছিল।

উপসংহারে বলা যায় যে, চোল শাসন ব্যবস্থায় একদিকে ছিল যোগ্য আমলাতন্ত্র এবং অন্যদিকে ছিল সক্রিয় স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি। এই দুইয়ের সাহায্যে চোল আমলের শাসন ব্যবস্থা যে উচ্চ মান লাভ করেছিল, তা হয়ত অন্য কোন হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক অবদান

পল্লব এবং চোলগণ দক্ষিণ ভারতে স্মরণীয় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সাফল্য কেবল রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে তাঁদের অবদান ছিল আরও বেশি। তাঁদের সময় দক্ষিণ ভারতে একটি স্বতন্ত্র তামিল সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। আর্য সংস্কৃতি ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এই সভ্যতাকে সৃষ্টি এবং পুষ্ট করেছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি আর্য ও দ্রাবিড় সংস্কৃতির মধ্যে শুধু যোগসূত্র স্থাপন করেনি, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

আর্য সংস্কৃতির প্রভাবে এই আমলে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণদের

প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁদের জন্য ব্যাপক ভূমিদান থেকে এর পরিমাপ করা যায়। ধর্মের ক্ষেত্রে, এই আমলে, একদিকে যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অবনতি সূচিত হয়েছিল, তেমন অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মের প্রচারকগণই এই পর্বে রাজকীয় আনুকূল্য বিশেষভাবে লাভ করেছিলেন।

পল্লব রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের বিবর্তনের মধ্যেও আর্য আদর্শের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পল্লব আমলের প্রথম দিকে জৈন ও বৌদ্ধগণ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণগণ তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম দিকে পল্লব রাজ্যে জৈন ধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জৈনদের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। মাদুরাই এবং কাঞ্চীতে জৈনদের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। শ্রাবণ বেলগোলা ছিল জৈনদের অন্যতম ধর্মীয় কেন্দ্র। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধিকাংশ জৈন সন্ন্যাসী এই আমলে গুহাবাসী হয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতে আর্যায়নের প্রবণতা এ ক্ষেত্রেও একমুখী ছিল না। প্রথম দিকে জৈনদের ধর্মীয় সাহিত্য প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমশ এই সাহিত্যে তামিলের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

পল্লব আমলে কাঞ্চী অঞ্চলে, কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর উপত্যকায় এবং নেল্লোর জেলায় অবস্থিত বিহারগুলি বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল। এই আমলে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয়গুলি নিয়ে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এই বিতর্কে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ক্রমশ পশ্চাদপসরণ করেছিল।

এই যুগে মন্দির সংলগ্ন ঘাটিকাগুলি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনুদান সত্ত্বেও একান্তভাবে ব্রাহ্মণদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। যেহেতু এই ঘাটিকাগুলি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত, সেই হেতু এগুলি রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ঘাটিকাগুলি রাজার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করত। কিন্তু মাঝে মাঝে রাজার বিরোধী-পক্ষের সাহায্যপুষ্ট হলে, এগুলি প্রতিবাদীর ভূমিকাও গ্রহণ করত।

কাঞ্চী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি তখন নালন্দার তুলনায় খুব কম ছিল না। এ ছাড়া কয়েকটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ও ছিল। এ গুলিতে সংস্কৃত ছিল শিক্ষার বাহন। রাজদরবারে এবং সাহিত্যের ভাষাও সংস্কৃত ছিল। ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম এবং দণ্ডিনের দশকুমার চরিত এ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের দুইটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

তামিল ভাষায় এ যুগে গীতি কবিতা এবং মহাকাব্য দুই-ই রচিত হয়েছিল। লৌকিক ধর্মের প্রচারকগণ তামিল ব্যবহার করত, দক্ষিণ ভারতে অন্যান্য ভাষার তুলনায় তামিলের অগ্রগতি বেশি হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

এই পর্বে উত্তর ভারত থেকে যে ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণ ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা বৈদিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক ছিলেন। উত্তর ভারতে শক, কুষাণ, হূণ ইত্যাদি ম্লেচ্ছদের প্রভাব থেকে বৈদিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করাই তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ব্রাহ্মণদের প্রভাবে এবং রাজকীয় দাক্ষিণ্যের ফলে দক্ষিণ ভারতে বৈদিক আচার অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছিল। বারংবার অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে এই যুগে বৈদিক উত্তরাধিকার বিনা-বাক্যে গৃহীত হয়েছিল, এমন দাবি করা যায় না। বৈদিক দর্শনের মধ্যে যে অস্পষ্টতা এবং অসঙ্গতি ছিল, তা দূর করার জন্য আন্দোলনও এই যুগে শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শঙ্করের জীবন কাহিনী বিশেষ জানা যায় না। তিনি ছিলেন নাম্বুদিরি ব্রাহ্মণ। ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মাত্র বত্রিশ বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন। এই পরিদৃশ্যমান জগতকে তিনি সত্য বলে মনে করতেন না। তাঁর কাছে এ ছিল মায়া। তিনি মনে করতেন যে, মানুষ তার ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে পারে না। একমাত্র সন্ন্যাস ব্রতের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়-গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, সে প্রকৃত সত্যের আভাস পেতে পারে। তিনি বেদের পবিত্রতায় বিশ্বাসী হয়েও, অর্থহীন বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ এবং তাঁর অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন প্রচার করেছিলেন। বিরোধীদের ধর্মীয় বিতর্কে পরাভূত করায় তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি। তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘের আদর্শে হিন্দু সন্ন্যাসীদের পুনর্গঠিত করেছিলেন। তাঁর ধর্মমতকে স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, উত্তরে বদ্রীনাথে, পশ্চিমে দ্বারকায়, পূর্বে পুরীতে এবং দক্ষিণে, শৃঙ্গেরি এবং কাঞ্চীতে মঠ স্থাপন করে-ছিলেন। তাঁর মতবাদ নিশ্চিতভাবে উপনিষদ এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা ভাবিত হয়েছিল। অথচ তিনি বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মের প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। অদ্বৈত বেদান্ত দর্শনের প্রচারে এবং বিরোধীদের সঙ্গে বিতর্কে নিরলস ব্যাপৃত থেকে তিনি ভারতের ধর্মচর্চার কেন্দ্রগুলিতে নতুন প্রাণের সাড়া জাগিয়েছিলেন। তবে তাঁর ধর্মমতে সদর্থক দিকের অভাবের জন্য এই স্থানগুলি ভবিষ্যতে নিষ্প্রাণ তত্ত্বালোচনার কেন্দ্রে পর্যবসিত হয়েছিল।

উত্তর ভারত থেকে শুধু যে বৈদিক সংস্কৃতিই দক্ষিণ ভারতে এসেছিল, এমন নয়। অবৈদিক এবং একান্তভাবে ভক্তি-নির্ভর শৈব ও বৈষ্ণবধর্মও এসেছিল। বৈদিক সংস্কৃতি রাজানুগ্রহ লাভ করলেও সাধারণ মানুষ বিশেষ ভাবে শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল। পরবর্তী কালের ভক্তি-আন্দোলনের সূচনা এইভাবে হয়েছিল বলা যায়। তামিল শৈব সন্ত, নয়নার

এবং বৈষ্ণব সন্ত, আলবারদের রচিত স্তোত্রে এই উভয় ধর্মের জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। (পূর্বে বর্ণিত 'ধর্ম' ও 'তামিল সাহিত্য' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।) এই তামিল সন্তগণ তাঁদের স্তোত্রের সঙ্গে সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র (বিশেষত বীণা) এবং মন্দিরের নৃত্যানুষ্ঠানকেও জনপ্রিয় করেছিলেন। পরবর্তী কালের প্রখ্যাত ভরত নাট্যমের সূচনা এইভাবে হয়েছিল।

পল্লবদের সময় তামিল সংস্কৃতিতে যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, চোল আমলে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছিল। এই পর্বে চোলগণ যেমন একদিকে আরব বণিকদের অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, তেমন অন্যদিকে তামিল সংস্কৃতিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রসারিত করেছিল।

পল্লব আমলের ধর্ম ও দর্শন চিন্তায় শঙ্করের যে স্থান, চোল আমলে সেই স্থান বিশিষ্টাদ্বৈতের প্রবর্তক রামানুজের। একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মাদ্রাজের নিকট শ্রীপেরুম্বুদুরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বৈষ্ণব আচার্যগণের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তামিল ব্রাহ্মণ রামানুজ শঙ্করের মায়াবাদ খণ্ডন করেছিলেন। শঙ্কর জ্ঞানকে মুক্তির প্রধান উপায় বলে মনে করতেন। রামানুজ তা মনে করতেন না। তাঁর মতে জ্ঞান হল অন্যতম উপায় এবং তা শুদ্ধ ভক্তি এবং ঈশ্বরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের (প্রপত্তি) মত তত কার্যকর নয়। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের শিক্ষা উপ-নিষদে পাওয়া যায় না। তাঁর বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে ভক্তিবাদের সঙ্গে বেদান্ত দর্শনের সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন প্রেম এবং ক্ষমার প্রতিমূর্তি। তাঁর আত্মভূত করণের দ্বারা পরম সুখ লাভ করা যায় না, তাঁর নিকটে অবস্থান করে তা পাওয়া যায়। রামানুজ এইভাবে ভক্তিবাদ এবং হিন্দু ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সেতু রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য সমগ্র ভারতে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাই তাঁর আদর্শ শুধু দক্ষিণ ভারতে নয়, উত্তর ভারতেও প্রসার লাভ করেছিল।

ধর্মীয় ব্যাপারে উচ্চবর্ণের বিশেষ সুবিধা তিনি মেনে নিয়েছিলেন। একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই বেদ পাঠের অধিকার আছে, এই ধারণার বিরোধিতা তিনি করেন নি। তবে শূদ্রদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নেই, একথা তিনি মানতে চান নি। তিনি যা চেয়েছিলেন, সবই যে করতে পেরেছিলেন, এমন নয়। শূদ্রদের মন্দির প্রবেশের অধিকার তিনি দিতে পারেন নি, তবে শূদ্রদের সম্পর্কে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অনমনীয় মনোভাবের ঈষৎ পরিবর্তন সাধন করতে তিনি পেরেছিলেন। অন্য ভাবে বলা যায় যে, তিনি ব্রাহ্মণদের কিছুটা আপোষরফা করতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় মন্দিরের দরজা শূদ্রদের জন্য উন্মুক্ত হয়নি সত্য, কিন্তু মন্দিরে অনেক অপ্রধান দেবদেবী এবং আচার অনুষ্ঠানের স্থান হয়েছিল। মন্দির প্রাঙ্গনে ছোট ছোট মন্দির গড়ে

Scanned with CamScanner

উঠেছিল। মন্দিরের বাইরে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হত এবং আপামর জনসাধারণ যাতে তা শুনতে পারে, সেই জন্য চাতাল তৈরি করা হয়েছিল। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেবদেবীর মূর্তি ছাড়া, সন্তদের মূর্তি স্থান পেয়েছিল। তৎকালীন সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে মন্দিরই ছিল প্রাণশক্তির আধার। এবং সেই শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখতে হলে, এই পরিবর্তন ছিল অবশ্যম্ভাবী। পল্লব ও চোল আমলের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য তাই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

পল্লব স্থাপত্য

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লব আমলে মন্দির-সমূহ থেকে শুরু হয়েছে। এই মন্দিরগুলিতে আমরা সর্বপ্রথম দ্রাবিড় শিল্প-রীতির সাক্ষাৎ পাই। শিল্প শাস্ত্রে দ্রাবিড় প্রাসাদের উপরিভাগকে, কখনও বা সমগ্র প্রাসাদকে, অষ্টভুজ অথবা ষড়ভুজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা অস্পষ্ট এবং দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলির সঙ্গে সর্বদা এই বর্ণনার মিল পাওয়া যায় না।

প্রথমে দ্রাবিড় মন্দিরগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়। বিমানের পিরামিডের মত উচ্চতা এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বিমান বহুতল। প্রতিটি তল গর্ভগৃহের প্রতিরূপ এবং নিচের তলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এর শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি, শিল্পশাস্ত্রে যাকে স্তূপ অথবা স্তূপিকা বলা হয়। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে এই তলগুলি এত ঘনসন্নিবিষ্ট, এবং সেগুলিতে আনুষঙ্গিকের বাহুল্য এত বেশি যে, এই তলগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে থাকে একটি চতুষ্কোণ গর্ভগৃহ এবং একে ঘিরে থাকে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ আচ্ছাদিত বেষ্টনী, যাকে 'প্রদক্ষিণ' বলা হয়। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে, আয়তাকার স্তম্ভ দ্বারা কতকগুলি কুলুঙ্গী তৈরি করা হয়। চৈত্য-বাতায়নসহ উত্তল বেলনাকার কার্ণিস এবং উপরের তলগুলিকে ঘিরে অপরিসর অলিন্দ, এই মন্দিরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে এই মন্দিরগুলিতে স্তম্ভযুক্ত হলঘর, বিভিন্ন অংশের সংগে সংযোগ স্থাপক পথ এবং বৃহদাকার গোপুরমগুলি (তারণ) নির্মিত হয়েছিল।

পল্লব আমলে মন্দিরগুলি যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন, শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে নবীন আগন্তুক ছিলেন না। তাঁদের পিছনে নিশ্চয়ই বংশপরম্পরায় বহু যুগের শিল্পসাধনা এবং ঐতিহ্য কাজ করেছিল। তবে পূর্ববর্তী এই শিল্পীরা শিল্পের উপাদান হিসাবে কাঠ এবং অন্যান্য বিনাশশীল দ্রব্য ব্যবহার করেছিলেন বলে সেগুলি পাওয়া যায় নি। কিন্তু এই মন্দিরগুলির প্রাথমিক-

পর্যায়ে দারু শিল্পের চিহ্ন পাওয়া গেছে। শিল্প রীতির দিক থেকেও এই মন্দিরগুলিকে আকস্মিক সৃষ্টি বলা যায় না। এগুলিকে গুপ্ত যুগের তল-বিশিষ্ট মন্দিরের অভিযোজন বলা যায়। অবশ্য এই অভিযোজনের সময় শিল্পীগণ মন্দিরগুলিতে পূর্ববর্ণিত কিছু নতুন অংশ যোগ করেছিলেন। এই অংশগুলিই এই মন্দিরসমূহের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য।

পল্লব যুগের একদিকে পাহাড়-কাটা মন্দির এবং অন্য দিকে স্বাধীন, স্বতন্ত্র মন্দির। বলা যায় এই যুগে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। পল্লব শিল্পীগণ ধীরে ধীরে দারুশিল্প এবং গুহাস্থাপত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন। পল্লব যুগের প্রথম পর্বের স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সবই পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল। এই নিদর্শনগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে আমরা প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের রাজত্বকালে নির্মিত সাধারণ স্তম্ভযুক্ত মন্ডপগুলিকে স্থান দিতে পারি। অনেকাংশে অনুরূপ, কিন্তু ব্যাপকতর মন্ডপ এবং একশিলা মন্দিরসমূহ, যেগুলিকে রথ বলা হয়, দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। এগুলি প্রথম নরসিংহ বর্মণ মহামল্ল এবং তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী শাসকদের সময় নির্মিত হয়েছিল।

প্রথম মহেন্দ্র বর্মণের রাজত্ব কালে নির্মিত সবগুলি পাহাড়-কাটা মন্দিরই যে এক ধরনেও ছিল, এমন নয়। তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে তৈরি মন্দির-গুলির সঙ্গে শেষ দিকে তৈরি উন্ডবল্লির (গুন্টুর জেলা) অনন্তশায়ন মন্দির এবং ভৈরবকোন্ডের (উত্তর আর্কট জেলা) মন্দিরগুলির তুলনা করলে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য চোখে পড়ে। পূর্বতন মন্দিরগুলি সহজ সরল। অনন্তশায়ন মন্দিরটি কিন্তু ঠিক তা নয়। মনে হয় এটি বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। স্তম্ভযুক্ত মন্ডপ দ্বারা নির্মিত চারতলা এই মন্দিরের উচ্চতা ৫০ ফুট। ভৈরবকোন্ডের মন্দিরের ব্যাপকাকার এবং অলংকৃত স্তম্ভগুলিতে নিশ্চিত-ভাবে পল্লব যুগের শিল্প বৈশিষ্ট্যের সূচনা চোখে পড়ে। এই স্তম্ভগুলির নিম্নভাগে এবং শীর্ষদেশে সর্বপ্রথম সিংহ মূর্তি যোগ করা হয়। এই স্তম্ভ-গুলি পরে আরও পরিশীলিত হয়ে, মহামল্ল গোষ্ঠীর মন্দিরগুলিতে উজ্জ্বল শিল্প নিদর্শনরূপে বিবেচিত হয়।

মহামল্ল গোষ্ঠীর রাজাদের সময়ের স্থাপত্য নিদর্শন সবগুলি মাদ্রাজের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, সমুদ্র তীরে, মামল্লপুরমে (মহাবলিপুরম) পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত মন্ডপ দশটি এবং রথ আটটি। মহেন্দ্র বর্মণের মন্ডপগুলির তুলনায়, এই মন্ডপগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত, তবে তাদের আয়তন এবং সাধারণ চরিত্র মোটামুটি একই রকমের। কোন রথই আয়তনে খুব বড় নয়। সর্ব বৃহৎ রথটির দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট, প্রস্থ ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ৪০ ফুট। রথগুলিকে

Scanned with CamScanner

সাধারণত 'সপ্ত প্যাগোডা' বলা হয়। এ গুলির শিল্পরীতি অনেকটা মণ্ডপ-গুলির মত, তবে তাদের মধ্যে পূর্বতন দারুশিল্পের চিহ্ন অতিশয় স্পষ্ট। এই রথগুলির অভ্যন্তর ভাগ অসম্পূর্ণ, তাই মনে হয় এগুলি কখনও ব্যবহার করা হয়নি। এই রথগুলির কয়েকটির সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব এবং দ্রৌপদীর নাম জড়িত। কয়েকটি রথকে বিহার অথবা চৈত্যের অনুলিপি বলে মনে হয়। আরও নির্দিষ্ট ভাবে বলা যায় যে, ভীম, সহদেব এবং গণেশের নামাঙ্কিত রথগুলি চৈত্য ধরনের। সম্ভবত মামল্লপুরমের সবগুলি রথই শৈব ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই রথগুলির মধ্য দিয়ে পল্লব স্থাপত্যের এক অধ্যায় শেষ হয়ে আর এক অধ্যায় আরম্ভ হয়। এই নতুন অধ্যায়ের মন্দিরগুলি আর আগের মত পাহাড়ে উৎকীর্ণ নয়, সেগুলি স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। এই অধ্যায়ের মন্দিরগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরগুলি রাজসিংহ গোষ্ঠীর রাজত্ব কালে (৭০০-৮০০ খৃষ্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দির-গুলির নির্মাণ কাল নন্দিবর্মণ গোষ্ঠীর রাজত্ব (৮০০-৯০০ খৃষ্টাব্দ)। প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের সংখ্যা ছয়। এদের মধ্যে তিনটি, তীর মন্দির, ঈশ্বর মন্দির এবং মুকুন্দ মন্দির আছে মামল্লপুরমে। একটি মন্দির আছে দক্ষিণ আর্কটের পনমলইয়ে। অন্য দুইটি মন্দির হল কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দির এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট। এগুলিতে পূর্ব যুগের তুলনায় কোন অগ্রগতির লক্ষণ পাওয়া যায় না। এই মন্দিরগুলিতে পল্লবদের অবনতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। এদের মধ্যে কাঞ্চী-পুরমের মুক্তেশ্বর এবং মতঙ্গেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য।

পল্লবগণ এই মন্দিরগুলির মধ্য দিয়ে অমরাবতীর শিল্প ঐতিহ্যকে লালন এবং বর্ধন করেছিলেন। কালক্রমে পল্লব শিল্প ঐতিহ্য ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদি হিন্দু উপনিবেশ সমূহের স্থাপত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

রাজসিংহ গোষ্ঠীর মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লপুরমের তীর মন্দির এবং কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ এবং বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। পাহাড়ে উৎকীর্ণ না হয়ে স্বতন্ত্র ভাবে নির্মিত হওয়ায় এই মন্দির-গুলিতে শিল্পীর স্বাধীনতা বেশি ছিল।

এই মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লপুরমের মন্দির প্রাচীনতম। একেবারে সমুদ্রের উপরে অবস্থিত হওয়ায় একে তীর মন্দির বলা হয়। বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত চতুর্ভুজাকার প্রাঙ্গনে মন্দিরটি অবস্থিত। এ থেকে মনে হয় যে মন্দিরটি যখন নির্মিত হয়েছিল, দক্ষিণ ভারতে মন্দির পরিকল্পনা তখন নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে ছিল। এই পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে পাশাপাশি দুইটি মন্দির অসমঞ্জস ভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে। প্রতিটি মন্দিরের একটি নিজস্ব পিরামিডাকার বিমান আছে এবং সেই বিমানটি একটি গম্বুজাকার স্তূপিক

এবং কারুকার্য মণ্ডিত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ। পূর্বদিকের সমুদ্রের মুখোমুখি মন্দিরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দুইটি মন্দিরের মধ্যে এই শিব মন্দিরটিই প্রধান। পশ্চিম দিকের দ্বিতীয় মন্দিরটি বিষ্ণুর। আকারে ও প্রকারে মামল্লপুরমের তীর মন্দির চতুষ্কোণ ধর্মরাজ রথের আদলে তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সুউচ্চ অথচ ক্ষীণ প্রতিটি বিমান এই মন্দিরকে বিশেষ ভাবে ছন্দোময় এবং প্রাণবন্ত করেছে। শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্যই এই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আংশিক সহায়তা করেছে। কিন্তু তার দ্বারা এই সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন যে, এক নতুন আকাঙ্খা এই শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁরা তাঁদের মনশ্চক্ষুতে একটি সুসমন্বিত মন্দিরের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তীর মন্দিরের অল্পকাল পরে রাজসিংহ পল্লব কর্তৃক নির্মিত কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরকে সুসমন্বিত রূপ কল্পনার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যায়। রাজসিংহ এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন এবং তাঁর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ এটি শেষ করেন। এই মন্দির সংলগ্ন সাতটি ক্ষুদ্র মন্দির সমগ্র মন্দির পরিকল্পনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এখানে মণ্ডপের বলিষ্ঠ স্তম্ভ এবং সিংহ মূর্তিগুলি সমগ্র পরিকল্পনার সঙ্গে বিস্ময়কর ভাবে মানিয়ে গেছে। তীর মন্দিরের বিমানের তুলনায় এই মন্দিরের বিমান অনেক বেশি সমৃদ্ধ এবং সুপরিমিত। এই মন্দিরের প্রবেশ পথ দেখে মনে হয় যে, এতে গোপুরমের সূচনা হয়েছিল। উপরের ভার বহন করার জন্য এই মন্দিরের ভিত গ্র্যানিট পাথরে তৈরি করা হয়েছিল। দুই প্রস্থ খিলানের উপর তৈরি এই মন্দিরের পিরামিড-প্রায় বিমান এবং তার উপরের গম্বুজ দেখলে একে বৌদ্ধ স্তূপ বলে মনে হয়। বহুতল যুক্ত সুউচ্চ বিমান এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মরাজ রথের একশিলা বিমানের তুলনায় এটি নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। এই মন্দিরে প্রাচীর বেষ্টিত চত্বর, গোপুরম, স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ এবং বিমান সবই যথাস্থানে উত্তমরূপে সংস্থাপিত হওয়ায় অধ্যাপক সরস্বতী একে দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম প্রধান নিদর্শন বলে মনে করেন।

কাঞ্চীপুরমের বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরটি বিষ্ণুর। কৈলাসনাথ মন্দিরের অল্পকাল পরে রাজসিংহ এটি নির্মাণ করেন। একে পল্লব স্থাপত্যের সবচেয়ে পরিণত নিদর্শন মনে করা হয়। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশ পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অংশগুলি ঘনসংবদ্ধ। শিল্পীরা এখানে শুধু ঐক্য বোধের পরিচয় দেন নি, তাঁরা অকারণ বাহুল্য বর্জন করেছেন। এক কথায় এই মন্দিরে দ্রাবিড় শিল্পরীতি আরও বেশি পরিশীলিত।

পরিশেষে বলা যায় যে পল্লব রাজাগণ উপরে বর্ণিত বিভিন্ন মন্দিরের মধ্য দিয়ে যে শিল্প ঐতিহ্য স্থাপন করেন, তাঁদের পরবর্তী চোল রাজাগণ তা ধারণ,

Scanned with CamScanner

এবং বহন করেছিলেন।

চোল স্থাপত্য

চোল রাজাদের সময় মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় শৈলী একটি বিশিষ্ট এবং উচ্চস্তরে প্রবেশ করেছিল। প্রথম দিকের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলি সাধারণত আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও, সেগুলি গঠনরীতির দিক থেকে সম্পূর্ণ। তাদের সঙ্গে পল্লব যুগের মন্দিরগুলির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক অতিশয় স্পষ্ট। পল্লব আমলের শেষ পর্বের মন্দিরগুলিতে যে জড়তা এসেছিল, চোলদের আদি পর্বের মন্দিরগুলি তা থেকে অনেকটা মুক্ত। এই মন্দিরগুলিতে সজীব শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। চোল রাজাদের এই প্রারম্ভিক প্রয়াসের মধ্য দিয়ে পল্লব যুগের মন্দির স্থাপত্য চোল আমলের উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছিল।

প্রথম পর্বের চোল রাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে দুইটি, বিজয়ালয়-চোলেশ্বর মন্দির এবং কদম্বনাথের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন প্রথম চোল সম্রাট বিজয়ালয় এবং দ্বিতীয়টি, প্রথম পরান্তক। প্রথম মন্দিরটি বৃত্তাকার এবং তাই কিছুটা অস্বাভাবিক। কিন্তু এর স্তম্ভযুক্ত মন্ডপ, তলযুক্ত বিমান শিখর এবং শীর্ষস্থ স্তূপিকা, সবই পল্লব ঐতিহ্যের স্মারক। কদম্বনাথের মন্দির এই পর্বের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য নিদর্শন। একটি উপাসনাগৃহ এবং তৎসংলগ্ন মন্ডপ দ্বারা গঠিত এই মন্দির সম্পূর্ণভাবে আধিক্য বর্জিত। এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৫০ ফুট। এই মন্দিরের পরিকল্পনা একান্তভাবে পল্লব যুগের। তবে এর অংশগুলির সরলীকরণের মধ্যে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এর স্তম্ভগুলির আকারে ও পরিকল্পনায় তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়ে। তাছাড়া এই মন্দিরের সামান্য অলঙ্করণের মধ্যে পরবর্তী চোল রাজাদের অতি অলঙ্কৃত মন্দির স্থাপত্যের পূর্বাভাস দেখা যায়।

রাজরাজ চোল এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্র চোল দ্রাবিড় মন্দির শিল্পে মহত্তম কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের অপ্রতিহত আধিপত্য এবং বিপুল সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন এই দুইজন চোল সম্রাট যে বিরাট মন্দির দুইটি নির্মাণ করেছিলেন তাকে তাঁদের ধর্ম ও সম্ভ্রমবোধের যোগ্য প্রস্তর নিদর্শন বলা যায়। প্রথম মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল তাঞ্জোরে। তাঞ্জোরের এই শিব মন্দির বৃহদীশ্বর অথবা রাজরাজেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। এর নির্মাণ কার্য ১০০৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়ে ১০১০ খৃষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল। দ্বিতীয় মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল চোলদের নতুন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে।

সুবৃহৎ আয়তনের জন্য তাঞ্জোরের মন্দিরকে দ্রাবিড় স্থাপত্য শিল্পের বলিষ্ঠতম নিদর্শন বলা যায়। তৎকালীন ভারতীয় মন্দিরগুলির মধ্যে এটি

বৃহত্তম এবং উচ্চতম। এই মন্দিরের বিমান, অর্ধমন্ডপ, মহামন্ডপ এবং সম্মুখস্থ বৃহৎ নন্দি চত্বর, সবই একটি প্রশস্ত (৫০০ ফুট × ২৫০ ফুট) প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গনের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি ক্রমশ পাঁচিল দিয়ে কেন ঘেরা হয়েছিল, বলা যায় না। এই মন্দিরগুলিতে আক্রমণ জনিত ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন একেবারে ছিল না, এমন নয়। তবে বাসাম মনে করেন যে, এটি প্রকৃত কারণ নয়। তাঁর মতে প্রকৃত কারণ হয়ত এই যে, মন্দিরগুলি রাজপ্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। উভয়ের মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এই মন্দিরের পূর্ব দিকে একটি গোপুরম। মন্দির প্রাঙ্গনে অন্যান্য ক্ষুদ্রাকার মন্দিরও আছে। কিন্তু সবার উপরে মাথা তুলে আছে একটি সুবৃহৎ বিমান বা শিখর। চৌদ্দতল, শীর্ষ দেশে একটি মাত্র প্রস্তর খন্ড দ্বারা নির্মিত বৃহৎ গম্বুজ সমন্বিত এই বিমানের উচ্চতা ২০০ ফুট। এই মন্দির পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল এর প্রকান্ড বিমান। বিমানের বিভিন্ন অংশের সরলতা একে একটি অপরূপ গাম্ভীর্য দান করেছে। এই বিমানকে তাই সমগ্র ভারতীয় স্থাপত্যের 'কষ্টিপাথর' বলা হয়েছে। সমগ্র মন্দিরের স্থাপত্যও কম আকর্ষণীয় নয়। পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এর বিভিন্ন অংশের সংস্থান পরিচ্ছন্ন এবং অলঙ্করণ পদ্ধতি নিখুঁত। এই সব গুণের জন্য ছন্দোময়, সমভার এবং সম্ভ্রান্ত এই মন্দিরটি দ্রাবিড় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রূপে বিবেচিত হয়।

তাঞ্জোর মন্দিরের প্রায় দুই দশক পরে রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাইকোণ্ডচোল-পুরমে তাঁর সুবৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। একই মহতী পরিকল্পনা পিতা এবং পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করলেও, দ্বিতীয় মন্দিরের বিশদ ও জটিল চরিত্র দেখে মনে হয় যে, এর মধ্য দিয়ে পুত্র তাঁর পিতার গৌরবকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন। এই মন্দিরটি নিঃসন্দেহে রাজেন্দ্র চোলের রাজত্বকালে চোল সাম্রাজ্যের অধিকতর সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

প্রাচীর বেষ্টিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গনের (৩৪০ ফুট × ১০০ ফুট) মধ্যে মন্দিরটি অবস্থিত। এর মন্ডপের আয়তন ১৭৫ ফুট × ৯৫ ফুট। প্রকান্ড বিমান এবং এই মন্ডপ একটি গলিপথ দ্বারা যুক্ত। মন্ডপটি অপেক্ষাকৃত নিচু। এর সমতল ছাদ ১৫০টির বেশি সারিবদ্ধ স্তম্ভের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন, এই মন্ডপের মধ্যে পরবর্তী কালের সহস্রস্তম্ভ দ্রাবিড় মন্ডপের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

তাঞ্জোরের বিমানের তুলনায় গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমের বিমানের উচ্চতা কম (১৬০ ফুট)। প্রথম বিমানের বলিষ্ঠ সরল রেখাগুলি একে একটি পুরুষোচিত গাম্ভীর্য দান করেছে, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিমানের বক্ররেখাগুলি একে নারীসুলভ কমনীয়তায় মন্ডিত করেছে। অনেকে বলেছেন যে, মহাকাব্য এবং

Scanned with CamScanner

গীতি কবিতায় যে পার্থক্য, দুইটি বিমানের পার্থক্য মোটামুটি তাই। অন্য ভাবে বলা যায় যে, একটি বিমান শক্তির প্রতীক এবং অপরটি সৌন্দর্যের। দুইটি মন্দিরেই স্থাপত্যের স্থান মুখ্য এবং অলঙ্করণের স্থান গৌণ। তবে রাজেন্দ্র চোলের মন্দির অলঙ্করণে কিছুটা অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের মন্দিরগুলিতে যে মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণ চোখে পড়ে, মনে হয় এই মন্দিরে তার সম্ভাবনা নিহিত ছিল। চোল মন্দির দুইটির বিরাট আয়তন এবং সূক্ষ্ম অলঙ্করণের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে যে, চোল শিল্পীরা পরিকল্পনা রচনা করতেন দৈত্যদের মত, কিন্তু তাঁদের নির্মাণ কার্য শেষ করতেন মণিকারদের মত।

রাজেন্দ্র চোলের পরে চোলদের সাম্রাজ্য মহিমা যেমন ক্ষুন্ন হয়েছিল, তেমন স্থাপত্য শিল্পেও তাঁরা তাঁদের পূর্ব গৌরব হারিয়েছিলেন। মন্দির নির্মাণ এই পর্বেও অব্যাহত ছিল, কিন্তু এই মন্দিরগুলি ছিল একান্তভাবে সাধারণ পর্যায়ের। একমাত্র অলঙ্কারবাহুল্য ভিন্ন তাদের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অন্য দিকে একটি অশুভ প্রবণতা এই পর্বে ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যে গোপুরমের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এই পর্বে সেগুলি ধীরে ধীরে আয়তনে, সংখ্যায় এবং জাঁকজমকে মূল মন্দিরকে আচ্ছন্ন, কখনও বা অতিক্রম করেছিল। কুম্ভকোনমের গোপুরম এ বিষয়ে একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

পল্লব ভাস্কর্য

পূর্বে বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারতে ভাস্কর্য শিল্পের সূচনাও পল্লব যুগেই হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে প্রথম স্মরণীয় নাম প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ। তাঁর সময় এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম গুহা মন্দিরগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাঁর পুত্র নরসিংহ বর্মণ মহামল্ল মামল্লপুরমের রথগুলি নির্মাণ করে শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন দিক নির্দেশ করেছিলেন। এই গুহা মন্দির এবং রথগুলি বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পে সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া উন্মুক্ত আকাশের নিচে পাহাড় কেটে কিরাতার্জুনীয় মহাকাব্যের কাহিনী রূপায়ণও এই পর্বের একটি স্মরণীয় সৃষ্টি। এই শিল্পকার্যগুলি পরবর্তী কালের দ্রাবিড় ভাস্কর্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই পর্বের পল্লব ভাস্কর্যে শেষ দিকের বেঙ্গি ভাস্কর্যের প্রভাব সমধিক। পল্লব ভাস্কর্যের ক্ষীণ এবং বিলম্বিত দেহ সৌষ্ঠব বেঙ্গি ভাস্কর্যের স্মারক। অধ্যাপক সরস্বতী মনে করেন যে বেঙ্গির মূর্তিগুলির তীব্র ভাবাবেগ পল্লব মূর্তিগুলিতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এসেছে। বেঙ্গির তুলনায় এই মূর্তিগুলি অধিকতর সংযত। পল্লবদের কোন কোন মূর্তিতে দাক্ষিণাত্য ভাস্কর্যের গুরুভার দেহের আভাসও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ভৈরবকোণ্ডের রিলিফগুলির কথা মনে আসে। সুতরাং সাধারণ ভাবে না হলেও, কোন কোন ক্ষেত্রে পল্লব ভাস্কর্যের উপর

সমকালীন দাক্ষিণাত্য ভাস্কর্যের প্রভাব একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

এই পর্বের ভাস্কর্যের মধ্যে মামল্লপুরমের কিরাতার্জুনীয় কাহিনী রূপায়ণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা এই ভাস্কর্যকে "গঙ্গাবতরণ" অথবা "অর্জুনের প্রায়শ্চিত্ত" নামে অভিহিত করা হত। কিন্তু অধুনা মনে করা হয় যে এতে কিরাতার্জুনীয় কাহিনী রূপায়িত হয়েছে।

মামল্লপুরমে একটি পাহাড়ের সমুদ্রমুখী একদিকের সবটা জুড়ে প্রায় ৯০ ফুট লম্বা এবং ২৩ ফুট উঁচু রিলিফে মহাকাব্যটির বিষয়বস্তু মহাকাব্যিক রীতিতে খোদাই করা হয়েছে। সমগ্র দৃশ্যটি যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে, তা থেকে এই ভাস্কর্য পরিকল্পনা যে কত বৃহৎ, তা বোঝা যায়। অসংখ্য মানুষের এবং জীবজন্তুর পূর্ণাবয়ব মূর্তি এতে স্থান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মহৎ কাহিনীর রূপায়ণে তারা পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। কোন কৃত্রিম সীমা রেখা এই ভাস্কর্যকে আবদ্ধ করেনি। পাহাড়ের প্রান্ত পর্যন্ত এই ভাস্কর্য প্রসারিত। এখানে পাহাড়টিকে শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে পাহাড়ের সবগুলি বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো হয়েছে। তার ফলে সমগ্র পাহাড়টি একটি রিলিফে পরিণত হয়েছে। মানুষ, জীবজন্তু, দেবতা, নাগদেবতা, সন্ন্যাসী, অর্ধ-দেবতা ইত্যাদির একটি সম্পূর্ণ জগৎ এই ভাস্কর্যে, পরিপূর্ণ ভাবে উপস্থিত। অনেকে একে প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর চিত্র বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন ধরনের মূর্তি এই রিলিফে উপস্থাপিত হয়েছে, কিন্তু কোথাও ভারসাম্য ক্ষুন্ন হয়নি। এলোরার মূর্তিগুলিতে যে প্রচণ্ড কার্যকলাপ এবং অঙ্গভঙ্গির আভাস পাওয়া যায়, এই মূর্তিগুলিতে তা নেই। আগাগোড়া এক সংযমবোধ এই মূর্তিগুলিকে পৃথক-ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে বিশেষ গৌরবে মণ্ডিত করেছে। রিলিফটি ক্রম অনুসারে এমনভাবে সাজানো, যে দেখে মনে হয় যেন মূর্তিগুলি সমতল পাহাড়ের গা থেকে অবিরাম উঠে আসছে। সমগ্রভাবে এই রিলিফে বাঁচার আনন্দ এবং উচ্ছ্বাস বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তু এই ভাস্কর্যের উপজীব্য হওয়া সত্ত্বেও কোন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা তাতে স্থান পায় নি। সহজ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দরূপ সেখানে বিধৃত হয়ে আছে। মূর্তিগুলি আশ্চর্যরকম স্বাভাবিক। একথা শুধু মানুষ এবং দেবদেবীর মূর্তি সম্পর্কেই নয়, জীবজন্তুর মূর্তিগুলি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। পশুদের মূর্তিগুলিতে শিল্পীদের গভীর মমত্ব বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকে বলেছেন যে, তাদের সম্পর্কে গভীরতর অনুভূতির প্রকাশ সমগ্র প্রাচ্য জগতের অন্য কোন ভাস্কর্যে দেখা যায় না। পশু মূর্তির উপস্থাপনায় হাস্যরস সৃষ্টির সম্ভাবনাও শিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায় নি। তপস্বী বিড়ালের মূর্তিটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

Scanned with CamScanner

মামল্লপুরমের অনুপম ভাস্কর্য ভিন্ন, প্রায় অনুরূপ শিল্পের নিদর্শন গুহা মন্দিরের কয়েকটি রিলিফে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কৃষ্ণ মণ্ডপে পশু পালকের জীবন সংক্রান্ত দৃশ্যটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মহিষমর্দিনী মণ্ডপে দুইটি বিপরীতধর্মী বিষয়বস্তু, যুদ্ধ ও শান্তিকে অবলম্বন করে দুইটি প্যানেল রচিত হয়েছিল। একটি প্যানেলে দেবী দুর্গা তাঁর নারীবাহিনীসহ মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা। সমগ্র দৃশ্যটি তেজ ও কর্মের দ্বারা উদ্দীপ্ত। এই নাটকীয় দৃশ্যের মুখোমুখি দ্বিতীয় দৃশ্যে বিষ্ণু শেষ নাগের কুণ্ডলীর উপর অনন্ত শয্যায় শায়িত। সমগ্র দৃশ্যে এক গভীর প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত। অন্যান্য নাটকীয় দৃশ্যের মধ্যে বরাহ মণ্ডপের দুইটি রিলিফের উল্লেখ করা যায়। একটি রিলিফে বিষ্ণু বরাহ আকারে পৃথিবীদেবীকে উদ্ধারের কার্যে নিযুক্ত। অন্যটি বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম (অর্থাৎ ত্রিপাদ গ্রহণরত) মূর্তি। দুইটি মূর্তিই প্রবল গতিবেগ সম্পন্ন।

এই প্রাণশক্তির পরিচয় মামল্লপুরমের রথগুলির রিলিফে নেই। মূর্তিগুলি সেখানে একটি ফ্রেমে আবদ্ধ এবং অনেকাংশে তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মূর্তিগুলিকে তাই জড় পদার্থ বলে মনে হয়। দোলাচল সৌন্দর্য এগুলিকে প্রাণময় করে তোলেনি। এ কথা কেবল পুরুষ মূর্তি সম্পর্কে নয়, নারীমূর্তি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য।

উপসংহারে বলা যায় যে পল্লব ভাস্কর্যে বেঙ্গির প্রভাব থাকলেও এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে এসেছিল এবং এই ভাস্কর্য বেঙ্গির ইন্দ্রিয়পরায়ণতা থেকে প্রায় মুক্ত। বেঙ্গির মূর্তিগুলির শিথিল অবসাদের পরিবর্তে সংযত প্রবল শক্তি দ্বারা পল্লব মূর্তিগুলি চিহ্নিত। নারী মূর্তির তুলনায় পুরুষের মূর্তিতে, তার প্রশস্ত স্কন্ধে এই প্রাণশক্তির প্রকাশ বেশি। পোষাক ও অলঙ্কার বিরল, ক্ষীণ কটি এবং ক্ষুদ্রবক্ষ নারীমূর্তিগুলি সাধারণ ভাবে পুরুষ-নির্ভর। দেবী মূর্তিগুলিও অনুরূপ। গভীর অথবা সূক্ষ্ম অনুভূতির কোন পরিচয় এই মূর্তিগুলিতে পাওয়া যায় না। সংযত ও সম্ভ্রান্ত এই মূর্তিগুলির মনোভাব বিশেষভাবে নৈর্ব্যক্তিক মনে হয়। সমকালীন এলোরার গুহা মূর্তিগুলিতে যে গভীর রহস্য এবং আলোছায়ার খেলা দেখা যায়, এই মূর্তিগুলিতে তা নেই। অবয়বহীন পাহাড় থেকে উদ্ভূত হলেও, এই মূর্তিগুলি খুবই স্পষ্ট। সুতরাং সমকালীন আর্যাবর্ত অথবা দাক্ষিণাত্যের ভাস্কর্য থেকে মামল্লপুরমের রিলিফের স্থান স্বতন্ত্র।

চোল ভাস্কর্য

চোলদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, পাথরে এবং ধাতুতে, অসংখ্য মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। এই পর্বের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য নিদর্শন মন্দির গাত্রে, গোপুরমগুলিতে,

বিস্তৃত হলঘরগুলিতে এবং মন্দির সংক্রান্ত অন্যান্য অট্টালিকায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরঙ্গনাথ মন্দির, তাঞ্জোর এবং গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমের মন্দির, দরশুরমের ঐরাবতেশ্বর মন্দির, কুম্ভকোনমের মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই যুগের ভাস্কর্য শিল্পীগণ চোল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

চোল আমলের ভাস্কর্যে পল্লব পর্বের ঐতিহ্য পরিবর্তনের আকারে, দৃঢ়তর প্রত্যয়ে এবং অধিকতর জীবন্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পূর্বের তুলনায় দশম শতাব্দীর মূর্তিগুলির গঠন বলিষ্ঠ, কিন্তু প্রতিমা লেপ পূর্ববৎ। দশম এবং একাদশ শতাব্দীতে মোটামুটিভাবে এই ধারা অনুসৃত হয়েছিল। এই সময় শিল্পের সূত্রগুলি বিধিবদ্ধ হয়েছিল এবং সেই সূত্রে চোল আমলের ভাস্কর্যকে প্রাচীন শিল্পরীতি থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করেছিল। চোল আমলের প্রথম দিকের বলিষ্ঠ ভাস্কর্যে পূর্ব যুগের নমনীয়তা পুনরায় ফিরে এসেছিল। স্বেচ্ছাবৃত সংযম দ্বারা এই মূর্তিগুলির দেহভঙ্গি উদ্ভাসিত। এই মূর্তিগুলিতে কোন কিছু অর্থহীন অথবা কৃত্রিম নয়। পোষাক এবং অলঙ্কার এই মূর্তিগুলিতে দেহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং তা দেহের কমনীয়তা বৃদ্ধির সহায়ক। একাদশ শতাব্দীর শেষে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর শুরুতে, কোন কোন ক্ষেত্রে মূর্তি নির্মাণে কাঠিন্যের সূচনা এবং দেহের অংশবিশেষের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার ফলে এই ভাস্কর্যের শিল্পরূপ ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে চোল ভাস্কর্য পরবর্তীকালের দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্যের আদর্শ নিরূপণ করেছিল।

চোল আমলের দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য অপরূপ ধাতু মূর্তিগুলির জন্য অধিকতর পরিচিত। ভারতের ধাতু শিল্পে অনুরূপ মূর্তি ইতিপূর্বে কখনও তৈরি হয়নি। বাসাম বলেছেন, সমস্ত পৃথিবীতে এর তুলনা মেলে না। এদের মধ্যে যেগুলি সর্বোৎকৃষ্ট, সেগুলি আয়তনে বড়, ওজনে ভারি, সৌন্দর্য ও সরলতায় অনুপম। এই মূর্তিগুলির অনাবৃত মসৃণ শরীরে, ভারতীয় ভাস্কর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অলঙ্করণকে কখনও বাহুল্য মনে হয় না। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুপাত একান্তভাবে শিল্পশাস্ত্র সম্মত। শিল্পশাস্ত্রের বিধান মেনে চলা সত্ত্বেও তামিল শিল্পীগণ কীভাবে এই মূর্তিগুলিতে সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মিলন ঘটিয়েছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

দক্ষিণ ভারতে তখন নানা প্রয়োজনে এই মূর্তিগুলিকে ব্যবহার করা হত। প্রথমত তাদের মন্দিরে স্থাপন করা হত। দ্বিতীয়ত, বৎসরব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানাদিতে এই মূর্তিগুলি প্রদর্শিত হত। তৃতীয়ত, এগুলি আনুষ্ঠানিক এবং ধর্মীয় শোভাযাত্রার অংশ বলে বিবেচিত হত। এইসব কারণে এই মূর্তিগুলি এত ব্যাপকভাবে নির্মিত হয়েছিল। উপরন্তু ভক্তি থেকে উদ্ভূত এক তীব্র আধ্যাত্মিক এবং আবেগপূর্ণ আন্দোলন তখন দক্ষিণ ভারতের মানুষের মনকে

Scanned with CamScanner

অধিকার করেছিল। তাই এই মূর্তিগুলিতে আবেগ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল।

দক্ষিণ ভারতের মূর্তি তামা অথবা পঞ্চধাতুতে (পঞ্চলোহ) তৈরি। তবে পঞ্চধাতুতে তৈরি হলেও, এই মূর্তিগুলিতে তামার পরিমাণই বেশি থাকত। অন্তত প্রথম দিকের মূর্তিগুলি সম্পর্কে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। প্রথম দিকে সীসার ব্যবহার বেশি না থাকলেও, শেষ দিকে তা বেড়েছিল। পূর্ণগর্ভ এবং শূন্যগর্ভ, দুই ধরনের মূর্তিই তৈরি হত। তবে পূর্ণগর্ভ মূর্তিই ছিল সংখ্যায় বেশি।

দেব-দেবীর (শিব, পার্বতী, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ এবং রাম) মূর্তিই ছিল বেশি। তাছাড়া শৈব সন্ত, বৈষ্ণব আলবার, এমন কি কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্তিও নির্মিত হয়েছিল। রাজা-রাণীর মূর্তিও এই ধাতুশিল্পের অন্তর্গত ছিল। মূর্তি নির্মাণে ধর্মীয় প্রেরণা ভিন্ন হলেও, শিল্পরীতিতে কোন তারতম্য ছিল না। এই মূর্তিগুলির মধ্যে নটরাজ মূর্তি সর্বাধিক পরিচিত। চোল আমলের অপেক্ষাকৃত শেষ দিকে, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে, এই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু বিলম্বে হলেও, এই মূর্তিগুলিতে শিল্পীরা এমন এক শিল্প নিদর্শন রেখে গেছেন, বিশ্ব শিল্পের ইতিহাসে যা অতুলনীয়। সমকালীন প্রস্তর ভাস্কর্যে যে ক্লান্তির ছাপ চোখে পড়ে, এই ধাতু মূর্তিগুলি তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবে একেবারে শেষ দিকের মূর্তিগুলিতে কাঠিন্যের কিছু চিহ্ন রয়ে গেছে। গোলাকার এই মূর্তিগুলিতে শিল্পী মূর্তির সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং পার্শ্বভাগের উপর সমান ও পূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই মূর্তিগুলির পবিত্র ও মসৃণ দেহবিন্যাস, সৌষ্ঠবপূর্ণ ভাঁজ এবং সহজ নমনীয়তা তাদের স্বাভাবিকতায় ও ভারসাম্যে প্রশান্তি ও মহত্ত্বে মণ্ডিত করেছিল। অধ্যাপক সরস্বতী বলেছেন, দক্ষিণ ভারতের এই ধাতু ভাস্কর্যে গুপ্ত যুগের শিল্পাদর্শ যেন পুনরায় ফিরে এসেছিল।

চার হাত বিশিষ্ট তরুণ নটরাজ মূর্তির একটি পা দৈত্যের পিঠে স্থাপিত এবং অন্যটি, ভারতীয় নৃত্য শিল্পের পরিচিত মুদ্রায় উত্থিত। ডঃ নীহার রঞ্জন রায় বলেছেন, সারনাথের বুদ্ধের সঙ্গে এই নটরাজ মূর্তির তুলনা করা যায়। কুমারস্বামি বলেছেন, সারনাথের বুদ্ধ মূর্তি শুধু হওয়ার প্রতীক, কিন্তু নটরাজ মূর্তি, হয়ে ওঠার। এই 'হয়ে ওঠা' বলতে বোঝায় নিরন্তর পরিবর্তন, নৃত্য যার প্রতীক। আপাত দৃষ্টিতে এই পরিবর্তন অথবা নৃত্য অস্থির। কিন্তু তৎকালীন শিল্পীরা এই পরিবর্তন এবং অস্থিরতার মধ্যে অন্তর্নিহিত, অপরিবর্তনীয় শান্তি ও স্থৈর্যকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং নটরাজ মূর্তিতে তার শিল্পরূপ দিয়েছিলেন। দুইটি পরস্পর বিরোধী ভাবের, একদিকে চঞ্চল

প্রবাহের এবং অন্যদিকে অচঞ্চল শান্তির অপূর্ব সমন্বয় এই মূর্তিতে সাধিত হয়েছিল। এই মহৎ ও কঠিন প্রতীক ব্যঞ্জনা এবং তার অন্তর্নিহিত ছন্দ ও ভারসাম্যের জন্য নটরাজ মূর্তিকে ভারতীয় শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মনে করা হয়।

শৈব এবং বৈষ্ণব সন্তগণের মূর্তি নির্মাণের প্রেরণা ছিল ভক্তি। এবং এই ভক্তি, এই মূর্তিগুলিকে এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করেছিল।

Scanned with CamScanner